উপন্যাস

প্রকাশ্য দিবালোকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. ভোর বেলা রেডিয়োতে প্রথম আজানের সুর 2

২. আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের ওপর 17

৩. পোস্ট অফিসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি কাউন্টার................................. 37

৪. সিনেমা হলগুলিতে সন্ধ্যের শো... 62

৫. পাঁচদিন ধরে কলকাতা বন্দরে ধর্মঘট 73

৬. দরজা খুলেই ছবি দেখল 91

৭. একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর দিন 103

৮. খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের 115

১. ভোর বেলা রেডিয়োতে প্রথম আজানের সুর

ভোর বেলা রেডিয়োতে প্রথম আজানের সুর বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভরত গুপ্তর ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকেন তিনি। কোনোদিন ধড়ফড় করে উঠে বসেননি।

বিশাল ঘর, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। তাঁর শোওয়ার খাটটিও প্রকান্ড, অন্তত ছ-জন লোক স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারে, কিন্তু ভরত গুপ্তর একা ঘুমোনো অভ্যেস। তাঁর মাথার বালিশ দু-টি এবং পাশ বালিশ চারটি, বিছানার ধপধপে সাদা চাদর। ঘরের দেয়ালের রংও সাদা। এত বড়ো ঘরখানির কোনো দেয়ালে একটিও ছবি বা ক্যালেণ্ডার নেই। আয়নাও নেই।

জেগে উঠে প্রায় পনেরো মিনিট নিথরভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলেন ভরত গুপ্ত। বড়ো বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলেন। তিনি শবাসন করছেন।

তারপর তিনি উঠে বসলেন। হাত দু-খানি দু-পাশে ছড়ালেন, তুললেন মাথার ওপরে। ঘুম থেকে ওঠার পর মুহূর্ত থেকেই তাঁর মুখখানিতে দারুণ আত্মবিশ্বাসের ছাপ আঁকা। এই পৃথিবীতে অধিবাস সম্পর্কে তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

ভরত গুপ্ত দরজা খোলা মাত্র একজন চাকর ছুটে এল বারান্দা থেকে। তার হাতে পেয়ালা-পিরিচ। সে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছে। যদিও তখন সকাল সাড়ে ছটা, প্রত্যেকদিন ভরত গুপ্ত ঠিক একই সময় ঘুম থেকে ওঠেন, তবু ভৃত্যটি অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। ভৃত্যটির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রভু ও ভৃত্য সমবয়েসি। তফাতের মধ্যে এই, ভৃত্যটি বোবা। ভরত গুপ্ত ঘুম থেকে ওঠার পর এক ঘণ্টা কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কারুর কথা শুনতেও চান না।

পেয়ালা ভরতি চিরতার জল ছিল, ভরত গুপ্ত একটুও মুখ-বিকৃতি না ঘটিয়ে সেটুকু পান করলেন। শূন্য পেয়ালা নিয়ে ভৃত্যটি আবার ছুটে গেল বারান্দার কোণে। সেখানে ওটা রেখে আবার একটা রূপোর রেকাবি নিয়ে ফিরে এল। এতে রাখা আছে কল-ওঠা ভিজে ছোলা এবং আখের গুড়।

খানিকটা ছোলা ও গুড় মুখে দিলেন ভরত গুপ্ত, তারপর তার শোওয়ার ঘরের বিপরীত দিকের বাথরুমে ঢুকলেন।

বাথরুমটি প্রায় শোওয়ার ঘরের মতনই বড়ো। ঝকঝকে তকতকে। সাদা রঙের টালি বসানো। খাঁটি পর্সিলিনের বিরাট একটা বাথ টাব। অন্তত ছ-খানা ধপধপে সাদা বিভিন্ন আকারের তোয়ালে, অনেক রকমের শিশি ও কৌটোতে প্রসাধন দ্রব্য সাজানো রয়েছে, কিন্তু টুথ পেস্ট ও টুথ ব্রাস নেই। তার বদলে রাখা আছে আজই সকালে কেটে আনা টাটকা নিমগাছের ডাল। তাই দিয়ে তিনি দাঁতন শুরু করলেন।

বাথরুমে আলো জ্বলছিল, সেটা নিভিয়ে দিতে একটু যেন অন্ধকার বোধ হল। ভরত গুপ্ত বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। বাথরুমটা এমনভাবে তৈরি, যাতে এখানে পর্যাপ্ত আলো আসে। মুখোমুখি দু-টি বিশাল জানালায় অস্বচ্ছ কাচ বসানো, কিন্তু ওপর দিকে চার দেয়ালে আটখানা ঘুলঘুলি। অন্য দিন সেই সব ঘুলঘুলি দিয়ে বাঁকা সূর্যরশ্মি এসে সাদা মেঝেতে ঠিকরে পড়ে। ভরত গুপ্ত একবার ভাবলেন, তিনি কি চোখে কম দেখতে শুরু করলেন! দু হাতে চোখ ঘষলেন। তারপর খুলে দিলেন একটা জানলা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

সকাল বেলা মেঘলা আকাশ দেখলে ভরত গুপ্তর মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। তাঁর পরিচিত পৃথিবীতে সব কিছুই তাঁর ইচ্ছে মতন চলে। ঘুম ভাঙার পর প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে কেউ যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলে কিংবা তাঁর প্রয়োজনীয় কোনো একটা জিনিস যদি হাতের কাছে পাওয়া না যায়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই দু-তিনজন কর্মচারীর চাকরি যাবে। কিন্তু সকালে বাথরুমে সূর্যকিরণ না আসার জন্য কারুকে শাস্তি দিতে না পেরে তিনি

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বাথরুমে প্রমাণাকারের আয়নার সামনে প্রতিফলিত হল তাঁর ক্রুদ্ধ মুখ।

বাড়িখানি তিনতলা হলেও ঘরের সংখ্যা সাতাশ। বাথরুমের সংখ্যা আট। বাড়িটির সামনে-পেছনে দু-রকমের বাগান। সামনের দিকে কেয়ারি করে সাজানো দুর্লভ জাতের ফুলের গাছ, প্রধান গেটের দু-পাশে দু-টি বিরাট ইউক্যালিপটাস। পেছন দিকটা অনেকটা শিশু উদ্যানের মতন। রয়েছে ছোটো নকল পাহাড় ও ঝরনা, শিরীষ গাছের ডাল থেকে ঝোলানো দোলনা, পুরু কার্পেটের মতন সবুজ ঘাস, এককোণে মেহেদির বেড়া দিয়ে ঘেরা খানিকটা আলাদা জায়গা, সেখানে কৃত্রিম বরফ জমিয়ে স্কেটিং রিঙ্ক তৈরির ব্যবস্থা আছে। পেছন দিকের বাগানে দু-টি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে খেলা করছে একটি যুবতী মেমসাহেব। শিশু দুটি যমজ, চার বছর বয়েস।

বাগানের চার পাশ ঘিরে দেড় মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর, তার ওপরে কাঁটাতার। বাড়িটির সমগ্র এলাকা সাড়ে তিন বিঘে। কলকাতা শহর।

একতলায় সবই অফিসঘর বা কর্মচারীদের বাসস্থান। তিনতলায় থাকেন ভরত গুপ্তর স্ত্রী স্বরূপা দেবী। স্বরূপা দেবীর চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত, ছোট্টখাট্ট, অনেকটা বানরীর মতন। তবু তাঁর গর্ভে পাঁচটি বেশ সুন্দর চেহারার ছেলে-মেয়ে জন্মেছে। ইদানীং স্বরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর সারাদিনে একবারও দেখা হয় কিনা সন্দেহ। চার বছর আগে, তাঁর ইহজীবনের মতন স্বামী-সহবাস শেষ হয়ে গেছে, এখন তিনি পুজো-আচ্চায় মন দিয়েছেন। তাঁর স্বামী এখন শুধু প্রতি রবিবার দুপুর বেলা তিনতলায় এসে স্ত্রীর সামনে বসে আহার করেন। স্বরূপা দেবীর নিজের হাতের রান্না, মাত্র দু-তিনটি পদ, ওই দিন ভরত গুপ্ত নিরামিষ খান।

দোতলায় সাতখানি ঘরের মধ্যে চারখানিই ভরত গুপ্তর নিজস্ব, এর মধ্যে দু-টি ঘরে তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ কখনো ঢোকে না। একটি ঘরে থাকেন তাঁর বৃদ্ধ কাকা। পাশের ঘরে কাকার দেহরক্ষী একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। আর একটি ঘর অনেকটা বৈঠকখানার

মতন, সেটি ব্যবহার করে তার ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করে তাঁর ছোটো মেয়ে উজ্জয়িনী। অবশ্য ছেলে-মেয়েরা সেই সময়েই ঘরটা ব্যবহার করে, যখন ভরত গুপ্ত বাড়িতে থাকেন না।

এক ঘণ্টা পরে প্রাতঃকৃত্য সেরে ভরত গুপ্ত ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে একতলায় নেমে আসতে লাগলেন। দোতলার বারান্দার মুখে কোলাপসিবল গেট, তালা বন্ধ। গেটের বাইরে একজন লোক অপেক্ষা করছিল, তিনি এসে দাঁড়ানো মাত্র সে প্রথমে লম্বা স্যালুট দিয়ে তারপর অতিদ্রুত তালা খুলে দিল।

একতলায় এসেও ভরত গুপ্ত প্রথমেই অফিস ঘরে ঢুকলেন না। বাইরে বাগানে এসে দাঁড়িয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকালেন। ছেড়া ছেড়া মেঘ নয়, সিসের মতন রং। বাগানে ফুলগাছগুলোর অনেক ফুলের পাপড়ি মাটিতে ঝরে পড়ে আছে।

একতলাতেও ভরত গুপ্তর নিজস্ব ব্যবহার্য অফিসঘর দুটি। একটিতে বসে তিনি তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন। অন্যটিতে বসেন বাইরে থেকে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে।

এখন ঢুকলেন প্রথম ঘরটিতে। সেখানে তিনখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছেন একজন অর্থনীতির অধ্যাপক। ইনি প্রতিদিন এক ঘণ্টা ভরত গুপ্তকে সংবাদপত্র পড়ে শোনান।

ভরত গুপ্ত নিরক্ষর নন, দৃষ্টিশক্তিও ভালোই আছে, বহু দলিলপত্র তাঁকে পড়তে হয়, শুধু খবরের কাগজ তিনি নিজে পড়েন না। তার বদলে সাত-শো টাকা মাইনে দিয়ে এই অধ্যাপককে রেখেছেন। এই অধ্যাপক তাঁকে বিশেষ বিশেষ খবরগুলি পড়ে শোনান, সেই সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার এবং ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিদিনকার অবস্থা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। তবে, এ আর কোনো রকমে ক্লাসের ছাত্রদের বোঝানো নয়, ভরত গুপ্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, মাঝে মাঝে এমন জেরা করেন যে অধ্যাপককেও নাজেহাল হয়ে যেতে হয় মাঝে মাঝে।

অধ্যাপকের নাম জয়ন্ত দাশগুপ্ত। ভরত গুপ্ত এঁকে শুধু সাত-শো টাকা মাইনেই দেন-না, আরও কিছু দেন। বছরে দু-বার বম্বে ও দিল্লিতে বেড়াতে যাবার খরচ। কিছুদিন আগে অধ্যাপকের বিয়েতে তিনি দু-হাজার টাকা দামের গয়না পাঠিয়েছেন। কলেজ থেকে অধ্যাপক যা মাইনে পান, তার থেকেও সকালে এই এক ঘণ্টা কাজের জন্য তাঁর আয় বেশি।

ভরত গুপ্ত আজ ঘরে ঢুকেই বললেন, প্রফেসার, দেখো তো আজ আবহাওয়ার খবর কী? বৃষ্টি হবে?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত তাড়াতাড়ি দেখতে গিয়ে আবহাওয়া সংবাদটা খুঁজে পেতে আরও দেরি করে ফেললেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, তাই তো লিখেছে। বিকেলের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি–

না বৃষ্টি হবে না!

আকাশেও বেশ মেঘ রয়েছে।

না, বৃষ্টি হবে না।

অর্থনীতির অধ্যাপক হয়ে জয়ন্ত দাশগুপ্ত এইটুকু বুঝেছেন যে, চাকরি রাখতে গেলে মালিকের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। এবং এটুকুও জানেন যে, খোশামোদ করলে খুশি হবে না এমন মালিক দুনিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। সোজাসুজি, না হয় ঘুরিয়ে।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত হেসে বললেন, কাগজে আবহাওয়া সংবাদ যা লেখে, ঠিক তার উলটো হয়। কাগজে বৃষ্টি হবার কথা লিখেছে বলেই আজ মেঘ পালিয়ে যাবে।

ভরত গুপ্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এপ্রিল মাসে মেঘ জমলেই কথায় কথায় বৃষ্টি হয় না। কাল কোনো জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে? সারাভারতে?

কাগজ না দেখেই জয়ন্ত দাশগুপ্ত বললেন, না।

ভরত গুপ্ত চেয়ারে এসে বসলেন।

অধ্যাপক কাগজ নিয়ে পড়া শুরু করতে যাচ্ছিলেন, ভরত গুপ্ত হাত উঠিয়ে বললেন, একটু দাঁড়াও।

ভরত গুপ্ত সাদা রঙের টেলিফোনটা তুলে বললেন, আত্মারাম।

এ বাড়িতে পি বি এক্স বসানো আছে। ভরত গুপ্তকে ডায়াল করতে হয় না। একটু বাদেই টেলিফোন ঝনঝন করে বেজে ওঠে। একজনের গলা শোনা যায়, স্যার, আত্মারামজি লাইনে আছেন।

ভরত গুপ্ত বললেন, আত্মারাম, রাতে ঘুম ভালো হয়েছিল?

কে, ভরতজি? সকালেই টেলিফোন। কী সৌভাগ্য আমার। রাম রাম!

রাম রাম! ভালো ঘুম হয়েছিল?

ঘুমের দাওয়াই খেয়েছিলাম। দাওয়াই-এর জোরে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা ঘুম হল।

তোমায় ঘুমের দাওয়াই খেতে হয়। আমার কিছু লাগে না।

আপনি ভাগ্যবান লোক।

কতবার তোমাকে বলেছি, মন্ডা-মেঠাই খাওয়া একটু কমাও; এই বয়েসে বেশি মিষ্টি খাওয়া ভালো না! যাই হোক, তারপর সব খবর ভালো?

আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় এই একরকম।

আকাশের অবস্থা দেখেছ?

আকাশ? কেন, কী হয়েছে?

দেখোনি?

একটুক্ষণের নীরবতা। বোঝা গেল, আত্মারাম টেলিফোন ছেড়ে আকাশ দেখতে গেছে। ফিরে এসে বলল, মেঘ জমেছে, সেই কথা বলছেন? আমি ভাবলাম বুঝি পাকিস্তানিরা কিংবা চীনেরা বোম ফেলতে এল! বৃষ্টি হবে আজ।

মেঘ হলেই কি বৃষ্টি হয়?

আমাদের আলিপুরের এখানে খুব মেঘ জমেছে।

হাওয়া অফিসের কাছে তো, তাই সব মেঘ বুঝি ওদিকে যায়?

বৃষ্টি আজ হবেই।

না, বৃষ্টি হবে না।

কত?

দশ হাজার।

একেবারে দশ? পাঁচে থাকুন।

তুমি পাঁচ আমি দশ।

ঠিক আছে, আমিও দশেই রইলাম। কতক্ষণ সময়?

রাত বারোটা পর্যন্ত। ক্যাশ?

ক্যাশ। রাম রাম!

জয়ন্ত দাশগুপ্ত মুখ ফস্কে বলে ফেললেন, আপনি দশ হাজার টাকা বাজি ফেললেন?

টেলিফোন নামিয়ে রেখে, জয়ন্ত দাশগুপ্তর কথায় উত্তর না দিয়ে ভরত গুপ্ত বললেন, পড়ো!

জয়ন্ত দাশগুপ্ত তটস্থ হয়ে প্রথমে ইংরেজি কাগজ একখানা মেলে ধরলেন চোখের সামনে। হেড লাইনগুলো শুধু পড়ে যেতে লাগলেন দ্রুত। যে-খবরটা ভরত গুপ্তর পছন্দ হবে, সেটা পুরোটা শোনাবেন।

ভরত গুপ্ত আজ যেন একটু অন্যমনস্ক। বড়ো বড়ো খবরের দিকেও তাঁর আগ্রহ নেই। ইংরেজি কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেল। এবার বাংলা কাগজ। এরপর মুম্বাই-এর ইকনমিক টাইমস বাকি আছে।

বাংলা কাগজের একটি অকিঞ্চিৎকর খবর শুনে ভরত গুপ্ত হঠাৎ বললেন, আবার পড়ো।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত অবাক না হয়ে পারলেন না। এই খবরে ভরত গুপ্তর মতন মানুষের কোনো আগ্রহ থাকারই কথা নয়। তিনি পড়লেন, গৌহাটি, তেরোই এপ্রিল। বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের দাবিতে বিক্ষোভ। আজ অপরাহ্ েএখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক জমায়েতে আসামে বাংলা চলচ্চিত্র পুনঃপ্রদর্শনের দাবি জানানো হয়। গত বছরের গোলযোগের পর থেকে আসামের সর্বত্র বাংলা সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ আছে, সমস্ত হলে হিন্দি সিনেমা আসর জাঁকিয়ে বসেছে। স্থানীয় যুবসমাজ এর প্রতিবাদ জানান। এই সভায় বাঙালিদের সঙ্গে বহু অসমীয়া বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রও উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তাঁরা পথ পরিক্রমা করার পর জেলাশাসকের হাতে একটি স্মারকপত্র দিয়ে আসেন। খবরে প্রকাশ...

ভরত গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, ঠিক খবর দিয়েছে, না বানিয়ে লিখেছে?

বলছে তো নিজস্ব সংবাদদাতা!

বাংলা কাগজে অনেক কিছু বানিয়ে লেখে। দেখো তো, স্টেটসম্যান-এ ওই খবরটা আছে কিনা?

জয়ন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেও ইংরেজিতে সেই খবরটা পেলেন না। ভরত গুপ্ত আর কোনো মন্তব্য না করে বললেন, ঠিক আছে, এবার খুঁজে দেখো তো, নদিয়া আর মুর্শিদাবাদে কেরোসিনের অবস্থা সম্পর্কে কিছু লিখেছে কিনা?

না, দেখছি না তো!

এরা খালি আমেরিকা, রাশিয়ার খবর দিতে জানে। ইকনমিক টাইমস-এ দেখো, সিমেন্টের উৎপাদন নিয়ে ওরা কী বলেছে।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত আবার পড়তে লাগলেন। এক ঘণ্টা প্রায় হয়ে এসেছে। ভরত গুপ্তর একটা গুণ আছে, ঠিক এক ঘণ্টা হয়ে গেলেই ছুটি দিয়ে দেন। দেয়ালে বড়ো ঘড়ি টিক টিক করছে।

ভরত গুপ্ত আবার তাঁকে বাধা দিয়ে টেলিফোন তুললেন। আত্মারামকে আবার দাও তো! স্যার, আত্মারাম লাইনে আছেন। কে, আত্মারাম? ব্যস্ত ছিলে?

ভরতজি? রাম রাম। এত ঘন ঘন তলব, কী সৌভাগ্য আমার।

আত্মারাম, আমি ভেবে দেখলাম, আজ বৃষ্টি হতেই পারে না।

একটা হুকুম দিয়ে মেঘগুলো সরিয়ে দিন না।

মেঘ থাকলেও বৃষ্টি হবে না।

বেশ তো, রাত সাড়ে বারোটার মধ্যে টাকা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

অত কম টাকায় আমার পোষাবে না। ওটা যদি এক লাখ করি?

এক লাখ?

হ্যাঁ। আপত্তি আছে?

না, না, আপনি যখন বলছেন। ঠিক আছে, এক লাখই রইল। রাত বারোটা পর্যন্ত। ক্যাশ?

ক্যাশ। ঠিক আছে, রাম রাম!

জয়ন্ত দাশগুপ্তর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে এসেছে। বৃষ্টি পড়বে কি পড়বে না, তার জন্য এক লাখ টাকা বাজি! টাকা কি এদের কাছে খোলামকুচি? আর, এই শালা ভরত গুপ্তটা যে এত মাথা মোটা তা তো জানা ছিল না। আকাশ যেরকম কালো হয়ে এসেছে, তাতে আজ বৃষ্টি হবেই।

জয়ন্ত দাশগুপ্তর মুখের ভেতরটা নিশপিশ করছে। তিনি আজ ভরত গুপ্তর সঙ্গে বাজি ধরলে এক লাখ টাকা জিতে নিতে পারতেন অনায়াসে। ওঃ, এক লাখ টাকা পেলে কত কী করা যায়। বলে ফেলবেন নাকি মুখ ফুটে কথাটা?

না, অত ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। তাঁর নিজের এক লাখ তো দূরের কথা, এক হাজার টাকাও ক্যাশ দেবার সাধ্য নেই। যার টাকা থাকে না, সে কি বাজি ফেলতে পারে? জয় অবধারিত হলেও ওরা মানবে না, বলবে, আগে তোমার টাকা দেখাও! এ-রকম ঔদ্ধত্য দেখাতে গেলে যদি চাকরিটাই যায়।

মুখ তুলে জয়ন্ত দাশগুপ্ত চমকে উঠলেন। ভরত গুপ্ত তার মুখের দিকেই এক দৃষ্টে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লোকটা কি মনের কথা বুঝতে পারে নাকি?

ভরত গুপ্ত বললেন, প্রফেসার, তুমি অবাক হচ্ছ? কিন্তু বাজি ফেলাই তো আমার পেশা। আমার সতেরোরকম ব্যাবসা আছে, সব জায়গাতেই তো আমি বাজির খেলা খেলছি।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত কানের পাশটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, আজ্ঞে, মানে, শেয়ার মার্কেট কিংবা সাপ্লাই বিজনেসে স্পেকুলেশানের একটা মানে বুঝি, কিন্তু বৃষ্টি পড়বে কী পড়বে না–

ভরত গুপ্ত এবার হা-হা করে হাসলেন। তাঁর হাসির শব্দ অত্যন্ত জোরালো এবং তার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতার ভাব আছে। হাসির সময় সাধারণত মানুষের চোখ ছোটো হয়ে আসে। এঁর চোখ বেশি উজ্জ্বল হয়।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, বৃষ্টি পড়লে আমি হারব, এই তো? তাতেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আত্মারামকে আমার লাখখানেক টাকা ঘুষ দেওয়ার দরকার আছে। সেটা এইভাবে দেওয়া যাবে। আর একটা কথাও তোমরা জান না। জুয়া খেলায় হারার ক্ষমতা যার আছে, ক্ষমতা, মনে রেখো, সে-ই শেষপর্যন্ত জেতে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত–

জয়ন্ত দাশগুপ্ত উঠে পড়লেন। কেন যেন আজ নিজেকে খুব হীন মনে হচ্ছে তাঁর। ঠোঁটের কাছটা তেতো লাগছে।

ভরত গুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতেই তিন চারজন লোক ঘরে ঢুকল। এরা তাঁর নানা স্তরের কর্মচারী। এরা কেউ কেউ হুকুম শুনতে এসেছে, কেউ এনেছে কাজের ফিরিস্তি। ভরত গুপ্ত কলকাতা শহরে তাঁর চারখানা অফিস বাড়ির কোনোটাতেই নিয়মিত যান না। এখান থেকে বোতাম টিপে তাঁর অধিকাংশ কাজ সারেন। এই লোকগুলি তাঁর বোতাম।

এদের মধ্যে রয়েছে ভরত গুপ্তর সবচেয়ে বিশ্বস্ত, একান্ত সচিব গণেশলাল। লোকটি রোগা, লম্বা এবং সামান্য ট্যারা।

গণেশলাল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ভরত গুপ্ত তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আসামের লোকেরা নাকি বাংলা সিনেমা দেখতে চায়? এটা কি সত্যি?

গণেশলাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কী উত্তর দেবে খুঁজে পেল না।

ভরত গুপ্ত আবার বললেন, হুঁ, সিনেমা না দেখে বুঝি বাঁচা যায় না। ঠিক আছে, তুমি গৌহাটি আর ডিব্রুগড়ের দু-জন ম্যানেজারকে ট্রাঙ্ক-কল করো। বলো, এ মাসেই যেন ওদের হলে বাংলা সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা করে।

গণেশলাল বলল, কিন্তু স্যার, আসাম-মেঘালয়-মণিপুরের হিন্দি সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশানের রাইট আমরা নিয়েছি।

কথার মাঝখানে কথা বোলো না। ম্যানেজারদের বলবে, ভালো করে যেন বিজ্ঞাপন করে। নতুন করে বাংলা বই শুরু হচ্ছে বলে ফুল দিয়ে যেন সাজায়। খবরের কাগজের লোকদের ফ্রি পাস দিয়ে নেমন্তন্ন করবে। এই মাসেই হওয়া চাই।

আচ্ছা।

আর অর্জন সিংকে একটা কল বুক করো। ওকে বলবে, সেইদিন যেন আট-দশটা ছেলেকে পাঠায় ওখানে। অসমীয়া ভাষায় শ্লোগান দেবে। কয়েক বোতল মদ খাইয়ে পাঠাতে বলো, তা হলে ভালো পারবে।

বুঝেছি। স্যার, মারামারি—গন্ডগোল যদি হয়?

—জখম করলেই হবে, খুন করার দরকার নেই। একটা-দুটো মেয়ের শাড়ি ধরে টানবে। তবে, অর্জন সিংকে বোললা, এ কাজের জন্য সে দু-হাজার টাকার বেশি পাবে না। ওর খাঁই দিন দিন বাড়ছে।

কাজটা হয়ে যাক, তারপর ক্যাপ্টেন নিমপোকে বলে ওকে একটু ধাতানি দিতে হবে!

তাই দিও। আর, আর, আর একটা কি যেন—আচ্ছা, শ্রীবাস্তবকে খবর দাও, সে যেন যত পারে সিমেন্টের পারমিট কিনে যায়—এখন এক টনও বাজারে ছাড়বে না। কত টন জমা আছে, তার হিসেবটা পাঠাতে বলো।

হিসেবে আমার কাছেই আছে।

আমাকে দেখাবে। ও হ্যাঁ, নদিয়া-মুর্শিদাবাদের দিকে যে লরি ধর্মঘটের কথা ছিল, তার কোনো খবর পাচ্ছি না তো?

স্যার, অনেক চেষ্টা করেও রিয়াজুদ্দিনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রিয়াজুদ্দিনও তো এই সব করে।

ভরত গুপ্ত কঠোর চোখে তাকালেন গণেশলালের দিকে। চুপ করে রইলেন এক মিনিট। গণেশলাল চোখে চোখ রাখতে পারে না, মুখ নীচু করে।

ভরত গুপ্ত বললেন, গণেশ, রিয়াজুদ্দিন যদি জাহান্নামেও গিয়ে থাকে, তবু তাকে খুঁজে বার করতে হবে। কাজে অবহেলা আমি একটুও পছন্দ করি না। আমি চাই, দু-দিনের মধ্যে লরি ধর্মঘট। একটা লরিও যেন মুর্শিদাবাদ বা নদিয়ায় না ঢোকে। ওখানে যে কেরোসিন জমে গেছে, সেটা কি আমি জলের দরে বিক্রি করব?

না স্যার, আজই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভরত গুপ্ত চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তিনি কিছু চিন্তা করছেন। অন্যরা চুপ। চিন্তা করার সময় ভরত গুপ্তর চোখের মণি দুটো নড়াচড়া করে।

তিনি হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করলেন, সেই লোকটিকে খুঁজে পেয়েছেন?

এখনো ঠিক...

লোক লাগানো হয়েছে তো?

দশজন লোক লাগিয়েছি। কিন্তু আপনি যেমনটি বলেছেন, ঠিক সেইরকম কারুকেই তো-মানে, সেরকম কি কেউ আছে?

নিশ্চয়ই আছে। ভালো করে খুঁজুন। তাকে আমার দরকার।

তিনজনকে মোটামুটি বাছা হয়েছে। এখনো পরীক্ষা বাকি আছে। তবে, শেষ পর্যন্ত কেউই তো পাস করে না। আপনার কাছে নিয়ে আসব?

আমার কাছে আনবার আগে আপনারা ভালো করে পরীক্ষা করুন। এ জন্য যত টাকাপয়সা খরচ করতে হয় করবেন। এবারে আপনাদের কাজের ফিরিস্তি বলুন।

গণেশলাল ছাড়া বাকি তিনজন লোক এতক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন এবার এগিয়ে এসে বলল, স্যার, সেন্ট্রালের একজন মিনিস্টার আসছেন আজ, তিনি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

অবজ্ঞায় ভরত গুপ্তর মুখখানা কুঁচকে গেল। তিনি রুক্ষভাবে বললেন, আমার সঙ্গে? কেন?

তা জানি না, তিনি খবর পাঠিয়েছেন।

শ্রীবাস্তবের সঙ্গে কথা বলতে বললো। আমার সময় হবে না।

আর একজন তোক বলল, স্যার, কাল আমাদের আলিপুরের গোডাউনে পুলিশ রেড করেছিল। পাড়ার ছেলেরাও চেঁচামেচি করেছে। মনে হয়, আত্মারামজির লোকই ওদের লেলিয়ে দিয়েছে।

ভরত গুপ্ত প্রসন্নভাবে হাসলেন। বললেন, তাই নাকি? ঠিক আছে, আত্মারামের চন্দননগরের গোডাউন লুঠ করিয়ে দাও। পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় যেও না।

এইরকমভাবে ভরত গুপ্ত ব্যাবসার কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ওদিকে অধ্যাপক জয়ন্ত দাশগুপ্ত ওবাড়ি থেকে হেঁটে বড়ো রাস্তায় এসে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বাসের জন্য। এর মধ্যেই দারুণ ভিড় শুরু হয়ে গেছে। একটা ট্যাক্সি নেবেন কি নেবেন না, এই নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ল

তাঁর হাতে। তিনি দারুণ চমকে গিয়ে তাকালেন, ওপরের দিকে। আরও কয়েক ফোঁটা জল। বৃষ্টি নেমেছে। আপন মনে পাগলের মতন হেসে উঠলেন অধ্যাপক জয়ন্ত দাশগুপ্ত। এই বৃষ্টির দাম এক লাখ টাকা। ওরে বাবারে বাবা! এই বৃষ্টির মধ্যে নাচতে ইচ্ছে হয়। অন্য সময় বৃষ্টি শুরু হলেই জয়ন্ত দাশগুপ্ত অতিদ্রুত আশ্রয় নিতেন কোনো গাড়ি

২. আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের ওপর

আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের ওপর একটা তিনতলা বাড়ি। বাড়িটির একতলায় একটি টায়ার কোম্পানির শাখা অফিস। পেছন দিকে গুদাম। বাড়িটার দু-পাশে এমনভাবে রাস্তা তৈরি করা আছে, যাতে গাড়ি কিংবা লরি একদিক দিয়ে ঢুকে বাড়িটার পেছন দিক ঘুরে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। মালপত্র ওঠানো-নামানোর সুবিধে হয়। সন্ধ্যেবেলা অফিস বন্ধ হয়ে গেলে দু-জন দারোয়ান ছাড়া আর কেউ থাকে না।

দোতলা-তিনতলার সব ঘরের জানলা অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। ঝি-চাকর শ্রেণির দু একজনকে কদাচিৎ সামনের বারান্দায় দেখা যায়।

তিনতলায় থাকে একটি রূপসী রমণী। দিনের বেলায় কোনোদিন সে বাড়ি থেকে বেরোয়। পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকেই তাকে চোখেও দেখেনি। কখনো কখনো সে জ্যোৎস্না রাতে খোলা চুলে ঘুরে বেড়ায় ছাদে, আর গুনগুন করে গান গায়। তখন তাকে দেখলে মনে হতে পারে, কোনো পরী হঠাৎ নেমে এসেছে। কিংবা, রূপকথার তুলনা দিতে গেলে, কোনো রাক্ষসী বুঝি সেজেছে রূপসী রমণী।

মেয়েটির নাম ছবি। কাংরা পেইন্টিংসের মেয়েদের মতনই সে বেশ-বাস পরে থাকে। রঙিন ঘাঘরা, কাঁচুলি আর সূক্ষ্ম ওড়না, তার মুখে চিকচিক করে অভ্রের গুঁড়ো। সে অন্য প্রদেশের মেয়ে হলেও বাংলা বলে মাতৃভাষার মতন।

ছবির শোবার ঘরটির সব জানলা বন্ধ থাকলেও ভেতরে এয়ার কুলার লাগানো। এই ঘরের আসবাবপত্রে একটু বেশি বাড়াবাড়ি আছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট। জমকালো সোফা সেট, দরজা-জানলায় মখমলের পর্দা, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে অন্তত আট-দশ রকমের বিদেশি পারফিউম ও ক্রিমের শিশি। একটা কাচের আলমারিতে নানা রকম পুতুল ও খেলনা সাজানো। এই ঘরের মধ্যে মেয়েটিকেও একটা পুতুলের মতন মনে হয়।

বিছানায় মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে একটি যুবক শুয়ে আছে। সে এমনই নিশ্চল যে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে। যুবকটি বেশ লম্বা, ফরসা রং, প্রায় সুপুরুষই বলা যায়, কিন্তু মুখখানা নির্বোধের মতন। ওর নাম শোভনকুমার।

ছবি তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, এই, এবার ওঠো। সন্ধ্যে হয়ে গেল, এবার ভাগো। শোভনকুমার বলল, না যাব না।

ছবি ভুরু কুঁচকে বলল, আরে, এ-রকম বেকুব তো দেখিনি! এখানে থেকে কি মরতে চাও নাকি?

যুবকটি তড়াক করে উঠে বসে বসল, কে আমায় মারবে? কোন শালা?

ছবি এবার মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলল, ঠিক আছে, কেউ মারবে না। কিন্তু এবার যাও এখান থেকে।

তুমি আমাকে তাড়াতে চাইছ কেন? কত টাকা চাও।

শোভনকুমার তার শার্টের বুক পকেট থেকে খান চারেক এক-শো টাকার নোট বার করে দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল ছবির গায়ে। বলল, এই নাও! আরও চাই?

ছবি টাকাগুলো নিয়ে ঝুঁকে এসে শোভনকুমারের পকেটে ভরে দিল। তারপর ওর গাল টিপে ধরে বলল, বোকা ছেলে, টাকা খরচ করলে অনেক মেয়ে পাওয়া যাবে। আমার কাছে আস কেন?

আমি তোমাকেই চাই।

মরার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তুমি যে কলকাতায় এসেছ, তোমার কাকা জানেন?

না।

উনি কিন্তু সবই টের পেয়ে যান।

পেল তো বয়েই গেল। আমি ভয় করি নাকি? আমার ইচ্ছে মতন কলকাতায় আসতে পারব না! সব ব্যাবসাই তো আগে আমাদের ছিল।

তাই নাকি?

আলবৎ! এ তো আমার ঠাকুরদাদার কারবার। আমার বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর কাকা সব হাত করে নিয়েছেন। ঠাকুরদাদার মাথার গন্ডগোল, তাঁকে আটকে রেখেছে বাড়িতে, একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড তাঁকে পাহারা দেয়। আমাকে যেতে দেয় না ওবাড়িতে।

তোমার জন্যে তো রাঁচিতে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন তোমার কাকা। রাঁচির ব্যাবসাও তো...

আমি রাঁচির ব্যাবসা বেচে দিয়ে কলকাতায় চলে আসব।

কলকাতায় এসো না। বম্বে, দিল্লির দিকে চলে যাও।

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

তোমার সঙ্গে? কোন দুঃখে।

শোভনকুমার ছবির উরুতে হাত রেখে বলল, তুমি আমায় একটুও ভালোবাসো না? ছবি হাই তুলে বলল, যদি বাবু ধরতে হয়, তা হলে বড়ড়া বাবুই ধরব।

আমি শাদি করব তোমাকে। তুমি যদি চাও...

শাদি? হি–হি–হি-। আমি কি কেরানির মেয়ে নাকি যে বিয়ে না হলে আমার দুঃখ ঘুচবে না!

শোভনকুমার গম্ভীর হয়ে গিয়ে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো। সে আরও অনেক কিছু বলতে চায়, কিন্তু ঠিক ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। লোকে যখন মনের কথাটা ঠিক মতন প্রকাশ করতে পারে না, তখন হঠাৎ রেগে যায়।

রেগে গিয়ে সে আর কী করতে পারে, জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিল কার্পেটের ওপর।

ছবি তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, কী হচ্ছে কী? মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

শোভনকুমারকে আরও একটু রাগ দেখাতে হবে। তাই সে গালাগালির আশ্রয় নিল। রক্তবর্ণ চোখ করে বলল, তোমার তো কুত্তীর মতন কাকার পা চাটতেই ভালো লাগে, না?

ছবি বলল, হ্যাঁ, ভালো লাগে।

ছবি হাত বাড়িয়ে শোভনকুমারের পকেট থেকে টাকাগুলো আবার তুলে নিল। বলল, এগুলো আমার কাছেই থাক। তুমি এখন যাবে, না দারোয়ানকে ডাকব?

আমি এখানে আজ সারারাত থাকব।

নীচে ঘর আছে, সেখানে শুয়ে থাকো।

শোভনকুমার সবলে ছবিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি এইখানে থাকব। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। থাকতেই হবে। কাকাকে আমি খুন করে ফেলব একদিন। ঠিক খুন করব।

ছবি নিজেকে ছাড়াবার একটুও চেষ্টা করল না। শোভনকুমারের একটি হাত যে তার বুকের ওপরে, তাতেও তার কোনো হৃক্ষেপ নেই। তার সুর্মা-আঁকা চোখ ও টকটকে লাল রঙের ঠোঁটে তাকে বড়ো অপরূপ দেখায়। পাহাড়ি এলাকায় যেমন গন্ধহীন অনেক প্রকার সুন্দর ফুল ফোটে, ঠিক সেইরকম।

ছবি শোভনকুমারের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, পারবে?

শোভনকুমার বলল, কি? তোমার সঙ্গে আমি পারব না?

আরে বেওকুফ, মেয়েদের কাছেই শুধু গায়ের জোর দেখাতে পার। একটু আগে যা বললে, তা পারবে?

কী? কাকাকে খুন করতে তো? ঠিক একদিন খুন করব।

একদিন মানে, কবে?

শোভনকুমার একটু থতমত খেয়ে গেল। গলার আওয়াজ নীচু করে বলল, কয়েকটা লোক লাগাতে হবে। একদিন তাল বুঝে...

তোমার হাতে কত লোক আছে? তোমার কাকার চেয়ে বেশি?

বেশি লোক লাগবে কেন? ঠিক মতন লোক পেলে...

তুমি নিজে পারবে না?

আমি?

ছবিকে ছেড়ে দিয়ে শোভনকুমার আবার খাটে গিয়ে বসল। তারপর বলল, আমি নিজের হাতে ওসব নোংরা কাজ করি না।

ছবি তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল, যদি কোনোদিন পার, তারপর আমার কাছে এসো, ভালো করে আদর করব।

তুমি সত্যি চাও? কাকার সঙ্গে তোমার এত পেয়ার?

আমি দেখতে চাই, তুমি পার কিনা!

শোভনকুমার বীরের মতন বুকে থাপ্পড় মারতে মারতে বলল, পারব, পারব, ঠিকই পারব। একদিন কাকাকে সরিয়ে দিয়ে আমিই এই সব ব্যাবসা হাত করে ফেলব, সব কিছু আমার হবে...

এই সময় দরজায় ধাক্কা। ছবি দরজা খুলে দেখল, একজন দাসী। দাসী ফিসফিস করে বলল, বাবু এসেছেন।

কথাটা শুনেই শশাভনকুমারের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর সে যা শুরু করল, তা রীতিমতন হাস্যকর। সে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে খাটের তলা থেকে তার চটি জোড়া বার করবার জন্য নীচু হতেই বুক পকেট থেকে টাকা ও খুচরো পয়সা পড়ে গেল। তখন আবার সেগুলো কুড়োতে লাগল এবং চটিটা পায়ে গলাতে গিয়ে ছিড়ে ফেলল একটা স্ট্র্যাপ।

ছবি হাসতে হাসতে বলল, কী, এবার তোমাকে ধরিয়ে দিই তোমার কাকার কাছে?

শোভনকুমার ছবির হাত চেপে ধরে বলল, বাঁচাও! এবারের মতন বাঁচিয়ে দাও!

সব সাহস উড়ে গেল?

চুপ! আমি কোথায় যাব?

ছবি তার প্রায় ঘাড়ে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল বাইরে। বারান্দার ওপাশে আর একখানা ঘরে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিল বাইরে থেকে।

দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এসে ছবি চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ঘরের মধ্যে কোনো অসংগতি আছে কিনা। সিগারেটের টুকরোটা আগেই বাইরে ফেল দিলেও ঘরে এখনো একটা হালকা সিগারেটের গন্ধ রয়ে গেছে। সে তখন স্প্রে দিয়ে সুগন্ধ ছড়াতে লাগল।

ভরত গুপ্তর ডজ গাড়িখানা এসে থেমেছে বাড়ির পেছন দিকে। ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা একজন রক্ষী আগে নেমে দরজা খুলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল। ভরত গুপ্ত ধুতি আজ পাঞ্জাবিই পরে আছেন, চোখে কালো চশমা। তাঁর সঙ্গে আর একজন রয়েছে।

ভরত গুপ্ত বললেন, আসুন মিস্টার আসিফ।

মি. লুৎফর আসিফের পোশাক পাক্কা সাহেবের মতন। চেহারাও সুন্দর, টকটকে ফরসা রং। মেদহীন শরীর, সহজে বয়েস বোঝা যায় না, তবে পঁয়তাল্লিশের কম নয়। টু পিস সুট পরে আছেন, গলায় বো, বুক পকেট থেকে উঁকি মারছে ভাঁজ করা রুমাল, মাথার চুল এমন চকচকে কালো যে কোনো সন্দেহ নেই কলপ লাগানো। কালো রঙের জুতোতে এক বিন্দু ময়লা নেই। এঁরও চোখে কালো চশমা।

মিস্টার আসিফ গাড়ি থেকে নেমে একবার চারদিকে তাকালেন। তারপর বললেন, মি.

গুপ্তা, আপনার এখানে টেলিফোন আছে তো?

ভরত গুপ্ত বললেন, আপনি যা যা চাইবেন, সবই আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দু-জনে আর একটিও কথা বললেন না। তিনতলার রেলিংয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ছবি। সে আগে ওঁদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দিয়ে তারপর নিজে এল।

ভরত গুপ্ত একটা সোফা দেখিয়ে আসিফকে বললেন, বসুন।

আসিফ দাঁড়িয়ে থেকেই বললেন, আগে টেলিফোন।

ভরত গুপ্ত ছবিকে বললেন, টেলিফোনটা দেখিয়ে দাও।

ছবি এঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আসিফ টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছবি প্রথমে ভেবেছিল এই আগন্তুক তার রূপের তারিফ করছে। একটু বাদেই ভুল ভাঙল। ছবি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে আসিফ ফোন করবেন না। ছবি সরে এল।

ছবি ঘরে ফিরে এসে দেখল, ভরত গুপ্ত গম্ভীর মুখে বসে পা দোলাচ্ছেন। ছবির দিকে তিনি তাকালেন না।

ছবি জিজ্ঞেস করল, ওঁর জন্য কি কিছু খাবার-টাবার আনতে হবে?

উনি আসুন, ওঁকে জিজ্ঞেস করো।

ছবি তীক্ষ্ণ চোখে ভরত গুপ্তকে লক্ষ করতে লাগল। মেজাজ কীরকম আছে দেখতে চায়। ভরত গুপ্তর মেজাজ বোঝা সহজ নয়।

ভরত গুপ্তর পা দোলানিটা ছবির একটুও মনঃপুত হয় না। তার মানে উনি এখন গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন। এই সব লোককে বেশি চিন্তা করতে দিলেই বিপদ। কথাবার্তায় যদি ব্যস্ত রাখা যায়, তাই ছবি একটু আদুরে গলায় বলল, আপনি অনেক দিন আসেননি। আমি রোজ সন্ধ্যে বেলা আপনার জন্য–

ভরত গুপ্ত খুব কঠোরভাবে বললেন, এখন চুপ করো–

আসিফ একটা সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটাই রেখে গেছেন অ্যাসট্রেতে। তাতে ছবি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল।

আসিফ টেলিফোন সেরে ফিরে আসার পর ভরত গুপ্তর মুখখানা আবার বদলে গেল।

তিনি বললেন, বসুন, আরাম করে বসুন। কী খাবেন?

আসিফ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশ দেখে নিচ্ছেন। এইটাই ওর স্বভাব মনে হয়। তিনি বললেন, কী আছে? আমি হুইস্কি ছাড়া কিছু খাই না।

সে তো হবেই। কিছু খাবার-টাবার?

না, ধন্যবাদ। সূর্যাস্তের পর আমি কোনো খাবার মুখে ছোঁয়াই না।

ভরত গুপ্ত ছবির দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করলেন। ছবি কাচের আলমারি থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বার করল। রয়াল স্যালুট।

দু-টি গেলাসে দু-টি বড়ো পেগের পরিমাণ ঢেলে সে আসিফকে জিজ্ঞেস করল, সোড়া?

না, শুধু দু-টুকরো বরফ। ছবি দরজার কাছে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন দাসী আইস বক্স নিয়ে এল। যেন সে আগে থেকেই জানত। কিংবা এরা কোনো যন্ত্র।

হুইস্কির গেলাসে বরফ মিশিয়ে ছবি তুলে দিল আসিফ সাহেবের হাতে। অন্য গেলাসটি নিজের।

আসিফ একটু অবাক হয়ে ভরত গুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার?

ভরত গুপ্ত সহাস্যে বললেন, আপনি আমার সম্পর্কে ঠিকঠাক খোঁজখবর নিয়ে আসেননি মনে হচ্ছে। আপনার মতন লোকের পক্ষে তো এ-রকম কাঁচা কাজ করা ঠিক নয়।

আসিফ ভরত গুপ্তর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজিত হতে মোটেই রাজি নন। তিনি ভরত গুপ্তর হাসিটা উড়িয়ে দিয়ে শুকনো গলায় বললেন, আপনি পান করেন না?

না।

এসব জিনিস এখানে রাখা থাকে? এখানে কি আপনার নিয়মিত অতিথি আসেন?

না। আপনিই সম্মানিত অতিথি। তবে, ও খায়। ছবির দিকে তাকিয়ে ভরত গুপ্ত আবার ধীরস্বরে বললেন, আমি ওসব জিনিস খেয়ে শরীর নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু নেশাগ্রস্ত স্ত্রীলোক দেখতে আমার ভালো লাগে। আমি তো কখনো সিনেমা দেখি না।

আসিফ চশমাটা খুলে গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, ভালো।

হুইস্কির স্বাদ, ছবি নাম্নী মেয়েটির রূপ কিংবা ভরত গুপ্তর কথা—এর কোনটা সম্পর্কে তিনি এ মন্তব্য করলেন, তা বোঝা যায় না। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সাধারণ লোক নয়। এঁদের হাসি কিংবা গাম্ভীর্য খুবই অপ্রাসঙ্গিক।

ছবি মুখখানি মধুরতর করে প্রশ্ন করল, জনাব কি কোনো গান শুনবেন?

আসিফ সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, গান? তারপরেই হেসে আবার বললেন, আপনার গান শুনলে আমি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পেতাম, কিন্তু আমার সময় খুব কম।

ছবি বলল, আমি গান জানি না। আমি বলছিলাম রেডিয়োগ্রামের কথা।

আমরা এখানে কাজের কথা বলতে এসেছি।

ভরত গুপ্ত বললেন, কাজ তো আছেই। এখন একটু আরাম করুন।

কাজই আমার আরাম। গুপ্তাজি, আমার হোটেলে গেলেই কথাবার্তার সুবিধে হত।

আমি দুঃখিত মি. আসিফ। আমি কখনো কোনো হোটেলের ভেতরে পা দিই না। কলকাতায় যদিও আমার নিজের দু-খানা হোটেল আছে, কিন্তু সেগুলোর ভেতরের চেহারা কেমন দেখিনি।

তা হলে আপনি যখন অন্য শহরে যান?

—যে শহরে আমার বাড়ি নেই, সেরকম কোনো জায়গায় আমি গত দশ বছরের মধ্যে যাইনি।

আসিফের মনে হল, এই লোকটা একটা হামবাগ। একে দিয়ে কাজ আদায় করা শক্ত হবে না।

ভরত গুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে আবার যোগ করলেন, সেই জন্যই তো আপনাদের মুম্বাই শহরে, আমি কখনো যাই না।

গেলাস খালি হয়ে গেছে, ছবি আবার ভরতি করে দিল। ছবি যখন ঝুকে আসে, তখন তার বুকের অনেকখানি অংশ দেখা যায়। এইরকম নারিদের বুকের অনাবৃত অংশের দিকে পুরুষ মাত্রেরই দৃষ্টি আটকে যায়। কিন্তু আসিফ সাহেব এমনভাবে সেদিকে তাকাচ্ছেন, যেন তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন। নারীর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্যও এঁদের আলাদা সময় থাকে।

ভরত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়েটি উপস্থিত থাকলে কি আপনার কথা বলতে অসুবিধা হবে?

আপনি যদি অসুবিধা না মনে করেন।

ভরত গুপ্ত ছবিকে বললেন, তুমি অন্য ঘরে যাও। ডাকলেই এসো।

ছবি উঠে দাঁড়িয়ে আসিফ সাহেবের চোখে চোখ ফেলবার চেষ্টা করল একবার। সক্ষম হল না। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে মন্দগতিতে।

বাইরে বেরিয়ে ছবি এদিক-ওদিক তাকালো। রেলিং দিয়ে ঝুঁকে তাকালো নীচে। ভরত গুপ্তর দেহরক্ষী একতলায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ছবি চলে এল তালাবন্ধ ঘরটার সামনে। দরজার টক টক শব্দ করল দু-বার। শোভনকুমার কাছে আসতেই ছবি বলল, ধরিয়ে দেব?

শোভনকুমার বলল, তা হলে তোমার কী হবে?

আমার কিছু হবে না। আমি তো তোমাকে ঘরে আটকে রেখেছি।

আমাকে ধরিয়ে দিলে তোমার কী লাভ হবে?

তোমার কাকার কাছ থেকে ইনাম পাব–

আর কত ইনাম চাও?

আমি আরও অনেক অনেক কিছু চাই।

আর কে এসেছে?

দেখলে চেনা যায় না। চুপ করে থাকো।

আসিফ গেলাসে আর একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, আপনি জানেন গুপ্তাজি, আমি কলকাতার মাঠের সাতটা ঘোড়া কিনেছি। সব ক-টাই প্রাইজ হর্স।

হ্যাঁ, জানি।

তার মধ্যে একটা ঘোড়া চারদিন আগে মারা গেছে।

ঘোড়া বুঝি কখনো মরে না?

মানুষের মতন যখন-তখন মরে না।

ভরত গুপ্ত জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বললেন, মি. আসিফ, মানুষ আর ঘোড়ার তুলনাটা আপনি ঠিক দিলেন না। আমি তো শুনেছি, রেসের ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে আপনারা গুলি করে মেরে ফেলেন। অথচ দেখুন, মানুষ বুড়ো হলেও গুলি করে মারার নিয়ম নেই। অথচ, সব মানুষই তো রেসের ঘোড়া–সবাই দৌড়োচ্ছে। যে যে হেরে যায়, পিছিয়ে পড়ে, সে শুধু সামনের লোকদের নামে দোষ দেয়–

ভরত গুপ্তর এ ধরনের ভাবগর্ভ কথায় আসিফ একদম কান দিলেন না। সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, আমার ওই ঘোড়াটার নাম ছিল মাউন্ট ভিসুভিয়াস।

রেসের ঘোড়ার ওইরকমই সব অদ্ভুত নাম হয় বটে। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস ঘোড়া। ওটাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। খুবই দুঃখের কথা।

আমার কাছে খবর আছে যে আমার সব কটা ঘোড়াকেই এ-রকমভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে।

খুব খারাপ, খুব খারাপ।

আমি এই ব্যাপারেই আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে এসেছি।

মি, আসিফ, আমি ঘোড়ার কারবার করি না। আমার কারবার মানুষকে নিয়ে।

মানুষই ঘোড়ার কারবার করে। ঘোড়ারা কখনো ঘোড়ার কারবার করে না।

হা হা হা! এটা একটা কথার মতন কথা বটে!

ডক এরিয়ায় আমার তিনজন লোককে পুলিশ ধরেছে গত এক মাসের মধ্যে।

হ্যাঁ, এ খবর আমি শুনেছি বটে।

এ ব্যাপারে আপনি কী করতে পারেন?

মি. আসিফ, ডক এরিয়ায় আপনার যে তিনজন ধরা পড়েছে, তাদের আমি ছাড়াবার ব্যবস্থা করব। ওদের নামে আগে কেস উঠুক, শাস্তি হয়ে যাক, তারপর ওদের তিনজনের বদলে অন্য তিনজন জেল খাটবে। সে ব্যবস্থা আমার। কিন্তু তার বদলে...

ভরত গুপ্ত হঠাৎ থেমে আসিফের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আসিফ দৃষ্টি না সরিয়ে স্থির গলায় বললেন, আপনার টার্মস বলুন?

আপনার দলবলকে কলকাতার পোর্ট থেকে একেবারে দূর হয়ে যেতে হবে।

এটা কোনো টার্মস নয়।

এটাই আমার একমাত্র শর্ত। মুম্বাই আর চেন্নাইয়ের মাদ্রাজের পোর্ট আপনাদের হাতে আছে। এত দূর থেকে আপনারা কলকাতার পোর্টেও এসে অপারেট করবেন, এটা চলতে পারে না। এবার আমরা এই পোর্টটা হাতে নেব। রেসের ঘোড়া নিয়ে আপনি যা ইচ্ছে তাই করুন। ওই ব্যাপারে আপনাকে লড়তে হবে আত্মারামের সঙ্গে। কোনো জন্তুকে বিষ খাইয়ে মারার মতন নোংরা কাজ আত্মারামই করতে পারে। কিন্তু কলকাতার পোর্ট আপনাকে ছাড়তেই হবে।

আমি যে কাজে নামি, কখনো তা থেকে পিছিয়ে যাই না।

কাজে নামবার আগে অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখতে হয়।

কলকাতার পোর্ট আমাদের পুরোনো এরিয়া।

কিন্তু মুম্বাইতে থেকে আপনি কলকাতার পোর্ট কন্ট্রোল করবেন, এটা কতদিন চলবে?

তা হলে কি আমি এটা ধরে নিতে পারি, কলকাতার আমার যে তিনজন লোক অ্যারেস্টেড হয়েছে, সেটা আপনারই নির্দেশে?

তাদের ধরেছে পুলিশ। এ সম্পর্কে আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

কিন্তু এতকাল পুলিশ তাদের ধরতে পারেনি।

এসব অবান্তর কথা। আমি আপনাকে আমার শর্ত জানিয়েছি।

এতে যদি আমি রাজি হতে না পারি?

সেটা খুব দুঃখের কথা হবে।

আসিফ চুপ করে রইলেন একটু। তার সামনের হুইস্কির গেলাসটা খালি।

ভরত গুপ্ত সেই খালি গেলাস লক্ষ করে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আপ্যায়ন করবার জন্য বললেন, একি, আপনি আর নিচ্ছেন না কেন? দয়া করে কিছু নিন!

বরফের বাক্সটিতে বরফ গলে জল হয়ে গেছে। ভরত গুপ্ত চেঁচিয়ে ডাকলেন, ছবি, ছবি!

ছবি তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হল। তাকে কিছু বলতে হল না। সে চট করে বরফের বাক্সটি। নিয়ে গিয়ে বরফ ভরতি করে ফিরে এল। তারপর আসিফের পাশে বসে তাঁর গেলাসে ঢেলে দিল হুইস্কি।

আসিফ গেলাসটা তুলে নিয়ে বললেন, ধন্যবাদ।

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেললেন।

ছবি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আসিফের দিকে। আবার গেলাসে ঢালতে যেতেই আসিফ বললেন, থাক। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কলকাতা শহরটা বেশ সুন্দর।

ছবি মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনার ভালো লেগেছে?

ভরত গুপ্ত বললেন, কলকাতা শহরের সৌভাগ্য, মি. আসিফ।

আসিফ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলি।

সে কী, এরই মধ্যে?

আটটার সময় আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। গুপ্তাজি, আপনার সঙ্গে আবার পরে কথা হবে।

ভরত গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিশ্চয়ই। যেকোনো সময়। যখন আপনার খুশি। আপনার যেকোনো কাজে লাগতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

আসিফ ছবির দিকে ফিরে ঝুঁকে বিলেতি কায়দায় সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, আপনার সঙ্গ পেয়ে ধন্য হলাম। সন্ধ্যেটা খুব সুন্দর কাটল।

ছবি তার নিজের শরীরের অনেকখানি দেখালো আসিফকে।

ভরত গুপ্ত ওঁর সঙ্গে ঘরের বাইরে এসে বললেন, দাঁড়ান, আমার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আপনি যেখানে যেতে চান–

না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমি টেলিফোন করে দিয়েছিলাম, আমার জন্য গাড়ি নীচে অপেক্ষা করছে।

আসিফ জুতোর টক টক শব্দ তুলে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে শেষ সিঁড়িতে নেমে ঘুরে তাকালেন ছবির দিকে। কী ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টি!

ভরত গুপ্ত ঘরে ফিরে এসে আরাম করে বসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ছবি, এই লোকটি কীরকম?

ছবি নিজের জায়গায় বসে গেলাসে হুইস্কি ঢেলে বলল, মাথা খুব ঠাণ্ডা।

হুঁ, তাই না!

মাথার মধ্যে সবসময় অনেকরকম হিসেব ঘোরে।

ঠিক। লোকটা কাজ জানে। শুধু শুধু কী আর এত বড়ো হয়েছে?

আচ্ছা, উনিই কি...

উঁহু, অত কৌতূহল ভালো না। জান না, কৌতূহলের জন্যই বিড়াল মরে? ছবিরানি, তুমি। কীরকম আছ, তাই বলো।

আমি খুব ভালো আছি।

ভালো আছ তো, তোমার মুখে হাসি নেই কেন? চোখ ছটফটে কেন?

ছবি এসে ভরত গুপ্তর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর আদুরে গলায় বলল, কই, আপনি তো আজ আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়েই দেখছেন না?

ভরত গুপ্ত নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। যেন তিনি ছবির মুখের প্রতিটি রেখা পরীক্ষা করছেন। যেন, তাঁর দৃষ্টিতে তাপ আছে।

তিনি আলতোভাবে হাত ছোঁয়ালেন ছবির চিবুকে। তারপর হাতটা নেমে এল গলায়। ছবি বুকের ওড়নাটা ফেলে দিল। কৃত্রিমভাবে আট করা তার দুটি স্তন এখন স্পষ্ট। ভরত গুপ্ত সেখানে আঙুল দিয়ে কি যেন লিখতে লাগলেন। তিনি যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। আপন মনে বললেন, বা!

তারপর হঠাৎ এক চড় মারলেন ছবির গালে। অতর্কিত আঘাত সামলাবার আগেই অন্য গালে আর এক চড়। রীতিমতন জোরে।

ছবির ফর্সা গালে সঙ্গে সঙ্গে লাল আঙুলের ছাপ পড়ে গেল। সে মুখ চেপে ধরে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। মার খাবার কারণ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না।

ভরত গুপ্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, শোভন কোথায়?

ছবি আমতা আমতা করে বলল, আমি, আমি...

আরও মার খেতে চাও?

আপনার যদি মর্জি হয়...

শোনো, সে এ বাড়িতে এসেছে দুপুর সাড়ে তিনটের সময়। আমি খবর পেয়েছি, তারপর সে আর এখান থেকে বেরোয়নি। কোথায় রেখেছ তাকে?

ছবি উঠে দাঁড়িয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, আমি ভেবেছিলাম ওকে বাঁচাব। ও ভয় দেখিয়ে আমার সব গয়না কেড়ে নিতে এসেছিল। আমি ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওপাশের ঘরে তালা বন্ধ করে রেখেছি।

কীরকম ভাবে ভয় দেখালো? বন্দুক পিস্তল এনেছিল নাকি?

না। ও বলছিল, আমার নামে বদনাম করবে আপনার কাছে।

বদনাম করার কিছু আছে কি?

আপনার অজানা তো কিছুই থাকে না।

তবে ভয় পেলে কেন?

ভয় পাইনি তো। বাচ্চা ছেলে, ভাবলাম একটা ভুল করে ফেলেছে–

ওর বয়েস আর তোমার বয়েস সমান। বাচ্চা হল কি করে? দেখো, বোধ-হয় ওর ঘুম ভেঙেছে, ওকে ডেকে নিয়ে এসো।

ছবি ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ফিরে এল শোভনকুমারকে সঙ্গে নিয়ে। শোভনকুমার সত্যি সত্যি চোখ মুছছে। যেন এইমাত্র তার ঘুম ভাঙল।

সে হাতজোড় করে, থিয়েটারের বাজে অভিনেতাদের মতন ধরা ধরা কাঁপানো গলায় বলল, চাচাজি–

ভরত গুপ্ত হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, বোসো। কলকাতায় যখন আসবে, আগে থেকে খবর দিয়ে আসবে। এই শহরে একলা একলা ঘোরাফেরা করা ভালো নয়। ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে?

শোভনকুমার নিজের পৌরুষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বললে, ভালো!

হাটিয়ার দিকে দু-একর জমি নীলাম হবে। সেটা তুমি ডেকে নাও। পরে এক সময় এইচ ই সি- র জমির টান পড়বেই। তখন চড়া দাম পাবে।

ওদিকে জমির দাম বেশ বেড়েছে।

টাকার দরকার হলে বংশীলালকে জানাবে। তুমি নাকি আজকাল রেস খেলছ?

কই না তো! ও, সে মাত্র একবার–

টাকা বাড়াবার যেসব উপায় আমি বলে দিই, তা কি তোমার পছন্দ নয়? ঘোড়দৌড়ে টাকা করতে হবে! ও পথ ছাড়ো। কুনওয়ার সিং বলে যে-লোকটার সঙ্গে তোমার আজকাল খুব বন্ধুত্ব হয়েছে, তার সংস্রব একেবারে ছাড়বে। দরকার হয়, তাকে রাঁচি থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। তুমি না পার, বংশীলাল সেই ব্যবস্থা করবে। মনে থাকবে?

আজ্ঞে।

কুনওয়ার সিং দলিল জাল করে। ওসব লোকের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবারের দরকার নেই। যাক। তোমার স্ত্রী ভালো আছেন তো?

ছবি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো শোভনকুমারের দিকে। শোভনকুমার যে বিবাহিত, সেটা গোপন করে গিয়েছিল ছবির কাছে।

ভরত গুপ্ত এত দ্রুত এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন যে শোভনকুমার তাল রাখতে পারছে না। তার ব্যক্তিত্ব একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, তার কাকা তাকে যেকোনো সময়ে মৃত্যুদন্ড দেবেন। তাই আগে খেলা করছেন এইরকম।

ভরত গুপ্ত খর চক্ষে চেয়ে রইলেন শোভনকুমারের দিকে। প্রায় এক মিনিট কিছুই বললেন। শোভনকুমার মুখ নীচু করে বসে আছে।

ভরত গুপ্ত আস্তে আস্তে বললেন, তোমার বাবার কাছে আমি কথা দিয়েছিলাম যে অন্তত তিনবার আমি তোমার গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করব। একবার তুমি আত্মারামের কাছে গিয়ে আমাদের বাড়ির সব গোপন কথা ফাঁস করে দিতে গিয়েছিলে। আর একবার তুমি স্টিলের কোটা নিয়ে বেশি চালাকি করতে গিয়ে আমার বিশ লাখ টাকা ক্ষতি করিয়ে দিয়েছ। আর আজ। এবার থেকে তুমি সাবধান হও। আমি তোমাকে ভালো হয়ে ওঠার সুযোগ দিচ্ছি। আমার নিজের ছেলেকেও আমি শাস্তি দিতে ছাড়ি না।

৩. পোস্ট অফিসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি কাউন্টার

পোস্ট অফিসের মধ্যে রেজিষ্ট্রি কাউন্টারের সামনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে দীপু। আধঘণ্টা হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। একবার সে চেঁচিয়ে উঠল, ও দাদা একটু হাত চালান না!

তার আশেপাশের আরও কয়েকজন লোক অসহিষ্ণু মন্তব্য করে উঠল নানারকম। একজন বলল, আর আওয়াজ দেবেন না। যা-ও-বা হচ্ছে তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। ওনাদের তো মেজাজের ঠিক নেই!

রেজিস্ট্রি কাউন্টারে যে কর্মটি নীরবে কাজ করছিল, সে একবার মাত্র মুখ তুলে দুঃখিতভাবে হাসল আপন মনে। যে-গতিতে সে কাজ করছে, তার চেয়ে দ্রুত ইংরেজি লেখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। এক-একটা জায়গার নামে আবার যা খটোমটো বানান। তবে, পয়সা গুনতে সে ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় নেয়। প্রায় কারুর কাছেই খুচরো থাকে না, নানারকম উলটোপালটা হিসেব করে। গতকাল তার হিসেবে একটাকা ছ-আনা কম পড়েছে। নিজের পকেট থেকে দিতে হল। তিনদিন টিফিনে শুধু এক কাপ করে চা খাবে।

এবার দীপু এসে পৌঁছেছে কাউন্টারের সামনে। তার লম্বা খামটা বাড়িয়ে দিল। কেরানিটি সেটা ওজন করে বলল, দু-টাকা পঁচাত্তর।

দীপু বলল, এত লাগবে? আর একবার ওজন করুন তো।

কেরানিটি বলল, এইজন্যই তো দেরি হয়।

তবু সে আর একবার ওজন করল। ঠিকই আছে হিসেব। দীপু তার শার্টের বুক পকেট থেকে বার করে দিল একটা পাঁচ টাকার নোট। টাকাটা খরচ করতে তার বেশ গায়ে লাগছে। চাকরির দরখাস্ত। প্রতিটি দরখাস্ততেই সব সার্টিফিকেটের কপি দিতে হয়, ওজন বেড়ে যায়। তা ছাড়া মনে হচ্ছে, টাকাগুলো জলে যাচ্ছে।

পোস্ট অফিসের অন্য একটা কাউন্টার থেকে দীপুর একটি পরিচিত ছেলে ওকে দেখতে পেয়ে বলল, কী রে দীপাঞ্জন, কী করছিস?

দীপু বলল, দেখতেই তো পাচ্ছিস!

অত লম্বা লম্বা চিঠি লিখছিস কাকে?

আমি জেনারেল ম্যানেজার ছাড়া অন্য কারুকে লিখি না।

তুই একটা চাকরি পেয়েছিস তো শুনলাম?

ওরকম কত কী শোনা যায়।

রসিদ ও বাকি পয়সা নিয়ে দীপু সেখান থেকে সরে এল। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এল বাইরে। বন্ধুটি বলল, তুই এখন কোথায় আছিস রে? তোদের বাড়িটা তত বিক্রি হয়ে গেছে?

এখন দিদির ওখানে আছি। একটা ফ্ল্যাট-টলাট খুঁজছি।

কোথায় যাবি এখন? চল, একটু চা খাবি?

রে, আর একটা জায়গায় যেতে হবে, দেরি হয়ে গেছে।

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দীপু বলল, আরে।

তারপর সে আবার পোস্ট অফিসের মধ্যে ঢুকে গেল। রেজিষ্ট্রি কাউন্টারের কাছে আসবার চেষ্টা করতেই অন্যরা চেঁচিয়ে উঠল, পেছনে, পেছনে, লাইনে দাঁড়ান।

দীপু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। কাউন্টারের কেরানিটিকে জিজ্ঞেস করল, ও দাদা, আপনি আমাকে কত ফেরত দিয়েছেন?

কেরানিটি চমকে উঠে দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেন? কেন?

আমি আপনাকে পাঁচ টাকা দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কত ফেরত দেবেন?

ঠিকই দিয়েছি।

না, ঠিকই দেননি।

আপনার দেবার কথা দু-টাকা পঁচিশ, আপনি দিয়েছেন তিন টাকা পাঁচিশ। এক টাকা বেশি।

দীপুর হাতের তালুতে মেলে রাখা নোট ও খুচরো পয়সাগুলো গুনে দেখল কেরানিটি, তারপর তার থেকে একটা এক টাকার নোট তুলে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। একটা কথা না, একটা ধন্যবাদ না। যেন এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

আসলে খুব বেশি অভিভূত হয়ে গেলে মানুষ অনেক সময় কোনো কথা বলতে পারে না। এর আগে এক টাকা ছ-আনা গচ্চা দেবার জন্য যে লোক তিনদিন ধরে টিফিনের সময় চা ছাড়া আর কিছুই খাচ্ছে না, তার কাছে আরও একটা টাকার মূল্য অনেক।

কেরানিটির ধীরগতিতে কাজের জন্য লাইনের অনেকেই তার ওপর প্রসন্ন নয়। তারা দীপুর দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল।

দীপু বাইরে বেরিয়ে এসে বাসে ওঠার চেষ্টা করল। দুপুর বেলাতেই খুব ভিড়। এখন সিনেমার সময়। দীপুর দেরি হয়ে গেছে।

পোস্ট অফিসের লাইনে একজন লম্বা মতন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বেরিয়ে এল দীপুর পিছু পিছু। যে কাজে সে পোস্ট অফিসে ঢুকেছিল, সেকাজ হল না, এরপর থেকে সে দীপুকে গোপনে অনুসরণ করার কাজে নিযুক্ত হয়ে গেল।

দীপু কোনোরকমে একটা বাসে উঠে ঝুলতে লাগল পা-দানিতে। প্রত্যেক স্টপে নেমে দাঁড়াতে হয়। দু-তিনজন লোক নামে, তার চেয়ে বেশি লোক ওঠে। একবার নেমে দাঁড়াবার পর দীপু ফের ওঠার আগেই বাস ছেড়ে দিয়েছে। দীপু দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার অনুসরণকারী লম্বা লোকটিই টেনে তুলল তাকে। দীপু লোকটাকে চেনে না।

বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবার সময় দীপু একবার ভাবল, পোস্ট অফিসের লোকটাকে ওই একটা টাকা ফেরত না দিলেও হত। অকৃতজ্ঞ কোথাকার! যেন লাটসাহেব, যেন একটা টাকার কোনো দামই নেই। ওই টাকাটা থাকলে দীপু ট্যাক্সিতে যেতে পারত।

পর মুহূর্তেই, এই ধরনের চিন্তার জন্য দীপু নিজেকে তিরস্কার করল।

দীপু এসে নামল বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে। এতক্ষণ সে আশঙ্কা করছিল, শান্তা বুঝি এসে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শান্তা আসেনি। তখন তার মনে হল, শান্তা যে আগে আসবে আমি জানতাম। মেয়েরা কখনো আগে আসে নাকি?

রাস্তায় শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হাতে সিগারেট থাকলেও মনে হয়, একটা কিছু কাজ। দীপুর কাছে সিগারেট নেই। সিগারেটের দোকান বেশ দূরে। দীপু সে-দিকে সিগারেট কিনতে গিয়েও বারবার নজর রাখতে লাগল নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে। যদিও সে জানে, শান্তা এর মধ্যে এসে পড়বে না। সে জানতে পারে।

আবার দীপু লঘু পায়ে প্রায় দৌড়ে চলে এল সেখানে। দীপু জানে না, এইভাবে সে তার অনুসরণকারীকেও অযথা পরিশ্রম করাচ্ছে। লম্বা লোকটিও রাস্তার ওপারে আর এপারে দৌড়োদৌড়ি করছে দীপুর সঙ্গে সঙ্গে।

সিগারেট ধরিয়ে দীপু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ট্রাম, বাস, লোকজন এই শহরের দুপুরের দৃশ্য—এই সব কিছু থেকে সে কিছুক্ষণের জন্য আলাদা হয়ে যায়। সে স্বপ্নদর্শী যুবা, একা হয়ে গেলেই নানারকম স্বপ্নের মধ্যে মিশে যাওয়া তার স্বভাব।

সে যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করল শান্তা এখন কোথায়। কিন্তু বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা নদীর দৃশ্য। সেই নদীতে স্নান করছে শান্তা। নদীটা যেন এ পৃথিবীর নয়।

শান্তা এল ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে দীপুর কাছে এসে বলল, এই, তোমার কাছে খুচরো পয়সা আছে? তিরিশ পয়সা দাও!

দীপু ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে এসে বলল, আর এ-রকমভাবে একা একা ট্যাক্সিতে আসবে না।

শান্তা বলল, আমার ঠিক পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে। বাসে আসতে গেলে আরও অন্তত আধঘণ্টা লাগত।

নীলিমা দত্ত নিশ্চয়ই তোমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছিলেন?

তুমি কী করে জানলে?

আমি জানতে পারি!

এটা মেলেনি। নীলিমাদি আজ কলেজেই আসেননি।

দাঁড়াও, আমি বলছি। তুমি পেন হারিয়ে ফেলেছিলে।

না।

তুমি ভুলে গিয়েছিলে।

ঠিক। এটা ঠিক বলেছ।

দীপু সিগারেটটা ছুড়ে ফেলল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, হেরে গেলাম। জানি, ওটাও ঠিক বলিনি।

শান্তা জিজ্ঞেস করল, এবার আমি বলব আসল কারণটা?

থাক আর শুনতে চাই না।

আমরা কি আজ কোথাও গিয়ে কিছু খাব?

কী খাবার?

চীনে?

এই শহরে চীনে খাবারের দোকান আর ব্যাঙ্ক সমানভাবে বেড়ে যাচ্ছে দেখেছ?

হুঁ।

তার মানে, যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তারাই চীনে দোকানে খায়।

তার মানে খাওয়া হবে না। আমি কিছু খেতে চাই না বাবা। তুমি এ-রকম রাগী রাগী মুখ করে আছ কেন?

তার মানে, নিশ্চয়ই আমার রাগ হয়েছে।

কার ওপর?

ভেবে দেখি।

তাড়াতাড়ি ভাবো। আমরা কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াব না।

শান্তা তার চোখ থেকে সানগ্লাসটি খুলল। একটা রৌদ্রালোকিত প্রান্তর তার চোখে ঝলমল করে ওঠে। ওপরের গাছ থেকে একটা শুকনো পাতা খসে পড়ল তার গায়ে। একটা দমকা হাওয়ায় তার কুঁতে নীল রঙের শাড়ির আঁচলটা উড়তে লাগল পতাকার মতন। দীপু কখনো কখনো একে বলেছে স্বর্গের পতাকা। এখন সে এদিকে দেখছে না।

দীপু বলল, এই মাঠের মধ্যে রোদুরে রোদুরে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়?

শান্তা একটু দ্বিধা করে বলল, এই দুপুর বেলা?

রোদুরটাই তো আমার ভালো লাগছে।

শান্তা একটু লজ্জা পেয়েছে। পরবর্তী বাক্যটি বলতে তার দু-এক মুহূর্ত দেরি হল। সে বলল, কে দেখে ফেলবে।

দীপু বিস্ময়ে ভুরু উঁচু করতেই শান্তা তাড়াতাড়ি আবার যোগ করল, মানে, আমার ছাত্র ছাত্রীরা যদি আমাকে দেখে ফেলে, ওরাই লজ্জা পেয়ে যাবে। ওরাও তো একটু প্রেম করবে।

শান্তা মাত্র দু-মাস আগে একটা কলেজে লেকচারারের কাজ পেয়েছে। সেই ব্যাপারে ওর মুখে একটা খুশির ছাপ এখনো রয়ে গেছে। এখনো তাকে কোনো পরীক্ষায় গার্ড দিতে হয়নি, খাতা দেখতে হয়নি, অধ্যাপকদের মাইনে বাড়াবার দাবিতে রাস্তায় মিছিলে নামতে হয়নি। কাজটা তার ভালোই লাগছে।

দীপু বলল, এ তো কেলেঙ্কারির ব্যাপার। তুমি কলেজে চাকরি পেয়েছ বলে রাস্তায় আর ঘুরে বেড়ানো যাবে না? তাহলে যাব কোথায়?

আমাদের বাড়িতে চলো।

ইচ্ছে করছে না।

তা হলে চলো, হাওড়া স্টেশন থেকে কোনো লোকাল ট্রেনে চেপে কোথাও চলে যাই। তুমি বলেছিলে একদিন নিয়ে যাবে।

সেটা আজ নয়। আর একদিন। চাকরিতে জয়েনিং ডেটটা ঠিক হয়ে যাক। সেটা সেলিব্রেট করব।

তুমি চাকরি পেয়েছ? ঠিক হয়েছে কিছু?

হ্যাঁ, হয়েছে মোটামুটি।

শান্তার মুখের ভাব এতে খুব একটা বদলাল না। সানগ্লাসটা আবার চোখে দিয়ে পৃথিবীর রং ম্লান করে সে নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করল, কী চাকরি?

দীপু বলল, সেই যে কোম্পানিটাতে চেষ্টা করছিলাম, সেখানেই একটা পোস্ট খালি হয়েছে সেলস-এ। প্রথমে আটশো সাড়ে আট-শশা দেবে। তা ছাড়া প্রায়ই ঘুরেবেড়াতে হবে, টি এ আছে।

শান্তা মুখ গম্ভীর করে বলল, চলো, মাঠে একটু বসি। তুমি ওই চাকরিটা নিয়ো না।

দীপু ময়দানের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, কেন?

চাকরি করা তোমাকে মানায় না।

তা হলে আমি কী করব?

সবাইকেই কি চাকরি করতে হবে নাকি? তুমি ইচ্ছে মতন জীবন কাটাবে, বই পড়বে, ঘুরবে, যখন খুশি হবে তখন লিখবে।

দীপু শান্তার পিঠে আলতোভাবে একটা চাঁটি মেরে বলল, আহা-হা, তুমি চাকরি পেয়েছ বলে ট্যাক্সি করে আসবে, আর আমাকে আসতে হয় বাসে ঝুলতে ঝুলতে।

শান্তা তার ব্যাগটা দীপুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও। আমি তো চাকরি করছি, তোমার যখন যা দরকার হয় আমার কাছ থেকে নেবে।

দীপু ব্যাগটা নিয়ে শূন্যে লোফালুফি করতে লাগল। অনেকটা আপন মনে বলল, এর থেকে ভালো চাকরি আমার পক্ষে পাওয়া শক্ত। এটা ছেড়ে দিলে মুশকিল হবে।

তারপর শান্তার দিকে ফিরে বলল, এতদিন তো আমি চাকরি-টাকরির চেষ্টা করিনি। এখন একটা কিছু করতেই হবে। ছোড়দির বাড়িতে কি বরাবর থাকব নাকি?

কেন, ছোড়দির বাড়িতে ঘরের অসুবিধে হচ্ছে?

কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না। তবু বেশিদিন থাকা যায় না।

পুকুরের পেছন দিকটায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো গাছ। সেখানে বিভিন্ন আকৃতির ছায়া। দু-তিন জোড়া যুবক-যুবতী এখানে-ওখানে বসে অত্যন্ত মৃদু গলায় কথা বলছে। শান্তা একবার সাবধানে দেখে নিল, ওদের মধ্যে তার কেউ চেনা আছে কিনা।

ঘাসের ওপর দীপু চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। তার সাদা সার্ট, ময়লা হয়ে যাবে। সে বেশ লম্বা। লম্বা চেহারার পুরুষরা মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসার বদলে শুয়ে পড়তে চায়।

দীপু একটা সিগারেট ধরালো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আকাশকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি অত্যন্ত সুন্দর। তোমাকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমাকে আর আগের মতন ভালোবাসো না।

শান্তা বলল, আস্তে।

দীপু সে-কথা গ্রাহ্য না করে বলল, জীবনটা তো শুধু এইরকম গাছের ছায়ায় বসে থাকা নয়। হঠাৎ যখন খুব ঝড় ওঠে কিংবা বৃষ্টি নামে।

ওহে দার্শনিক, আমার কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে। কলেজে ক্লাস করে আসছি।

অপেক্ষা করো, একটু বাদেই চীনেবাদামওয়ালা আসবে।

দীপু এবার পাশ ফিরে শান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চাও না? তোমার ইচ্ছে করে না?

শান্তা খুব মৃদু গলায় বলল, করে।

দীপু এবার উৎসাহিত হয়ে কনুইতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে বলল, তা হলে? কোথায় থাকব, আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। একসঙ্গে থাকতে হলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হবে। যা শুনছি, আড়াই-শো-তিনশো টাকার কমে তো ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না। তারপর রোজ দু-বেলা খাবার। মানুষকে দু-বেলাই পেট ভরে খেতে হয়, এই একটা বাজে নিয়ম। নিয়ম আছে, অথচ খাবার পাওয়া যায় না। যাই হোক, আমরা না হয় একটু কম-টম করে খাব। মাঝে মাঝে জামাকাপড় কিনতেই হবে। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে চা-বিস্কুট না দিলে চলে না। এসব খরচ কোথা থেকে আসবে? চাকরি না করে চলে? ও, আরও তো একটা ব্যাপার আছে—একসঙ্গে থাকতে গেলে তার আগে বিয়ে করতে হবে—সেটাও তো একটা খরচের ব্যাপার।

শান্তা মুচকি হেসে বলল, তুমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে?

রীতিমতন চিন্তা, টাকার চিন্তা।

তোমাকে মানাচ্ছে না।

আমার চাকরি করা মানায় না, টাকার চিন্তা মানায় না, তা হলে আমাকে কি মানায়? শুধু প্রেম করা?

তুমি বড় জোরে কথা বলছ আজ! শোনো, আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, এই চাকরিটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকুরি, জান না?

তা হলেও।

আরও কয়েকটা জায়গায় চেষ্টা করছি। তবে, এর থেকে ভালো পাওয়া আমার পক্ষে শক্ত। আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে না। যার চাকরি করার একেবারে ইচ্ছে নেই, যে অন্য কিছু করতে চায়—তাকেও শুধু টাকার জন্য কেন একটা চাকরি করতে হবে।

শান্তা, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। টাকার জন্যই তো সব কিছু হয়! টাকা যার থাকে না, সে খেতে পায় না। যে খেতে পায় না, সে মরে যায়। খুব সিমপল।

তোমার খাওয়ার চিন্তা নেই।

আমার চিন্তা তোমার জন্য। শোনো, খুব সিরিয়াসলি বলছি, এ-রকম রাস্তায় ঘাটে দেখাশুননা আর আমার ভালো লাগছে না। আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আমি তোমাকে চাই চাই চাই চাই চাই।

এই আস্তে, প্লিজ, কী হচ্ছে কী!

আমি চৌরঙ্গির মোড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে এই কথা বলব?

যে কথাটা আমাকে শোনাবার জন্য, তা এত চেঁচিয়ে বলার দরকার কী?

তুমি তো শুনতে পাচ্ছ না কিছুতেই!

তুমি কিছু জান না!

এরপর দুই যুবক-যুবতী কিছুক্ষণ পরস্পরের চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে থাকে। প্রণয়ী ছাড়া অন্য কেউ এ-রকম দৃষ্টি জানে না। অনেক কিছু বিনিময় হয়ে যায়।

অদূরে একটি গাছের আড়ালে লম্বা মতন অনুসরণকারীটি অনবরত হাই তুলছে। সে তাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল মোটামুটি।

রাত আটটার সময় দীপু শান্তাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। নিজে তখনও বাড়ি ফিরল না। একা হয়ে যাবার পরেই তার মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এল গ্রে-স্ট্রিট আর শশাভাবাজারের মুখটাতে।

একটা দোকানে অনেকদিন পর কোরোসিন এসেছে, তার সামনে বিরাট লাইন। চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলি। রাস্তার পাশে নোংরার স্তূপ। বস্তির ছেলেরা খেলা করছে তার পাশেই। মোটরগাড়ির জ্যাম। উলঙ্গ ভিখিরি। বিরাট রাজনৈতিক পোস্টার। ভাঙা রাস্তা। এক-একটা ট্রাম থামছে আর ফুটো আলুর বস্তার মতন হুড়হুড় করে নামছে একগাদা নারী-পুরুষ, সকলেরই ভুরু কোঁচকানো মুখ।

এখানে কোনো সুন্দর দৃশ্য নেই। অথচ ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ প্রায় পরিষ্কার, কয়েকটি তারা দেখা যায়, কিছু হালকা সাদা মেঘ সেখানে খেলা করে।

দীপু একটা গলির মধ্যে ঢুকবে। সেখানে চার-পাঁচ জন যুবক দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। দীপু তাদের পাশ দিয়ে ঢুকতে যেতেই তারা কথা থামিয়ে ওকে ভালো ভাবে লক্ষ করল। দীপু কয়েক পা যেতেই তারা ডেকে জিজ্ঞেস করল, দাদা, কোথায় যাচ্ছেন?

দিনকাল অনেকটা বদলেছে, এখন আর তেমন ভয়ের কারণ নেই, তবু দীপুর শরীরে একটা শিহরন জাগে। বছর দু-এক আগে কেউ এইরকম সন্ধ্যের পর কোনো অচেনা পাড়াতে আসতেই সাহস করত না। এখনো অচেনা লোককে দেখলে লোকে প্রশ্ন করে।

দীপু আড়ষ্ট গলায় বলল, এ পাড়ায় আমার চেনা একজন লোক থাকেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

কত নম্বর বাড়ি? কী নাম?

তেত্রিশ নম্বর বাড়ি। অরুণপ্রকাশ ঘোষের কাছে যাব, উনি আমার মাস্টারমশাই ছিলেন।

এর আগে এসেছেন এবাড়িতে?

না। এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো?

যুবকদের দল থেকে একজন এগিয়ে এসে বলল, কিছু না। এমনিই। চলে যান-না, ওই তো সামনেই তিনতলা বাড়ি। দাদা আপনার কাছে সিগারেট আছে? একটা দিয়ে যান তো।

দীপু বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিল। যুবকটি হেসে বলল, কিছু মনে করলেন না তো?

দীপুও হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, না।

সে জানে, ওদের কোনো কাজ নেই। কেউ কোনো কাজ দেবে না। শুধু দিনের পর দিন গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে একঘেয়ে লাগে। দুর্গাপুজো, কালীপুজোর অনেক দেরি। এদিক দিয়ে সন্ধ্যের পর সচরাচর কোনো সুন্দরী মেয়েও যায় না যে আওয়াজ দেওয়া যায়। সুতরাং কোনো ছুতোয় একটা ঝগড়া বা মারামারি লাগাতে পারলেই কিছুটা রোমাঞ্চ পাওয়া যায়।

তিনতলা বাড়িটা একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। দীপু সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। সারা বাড়িতে একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। তিনতলায় সিঁড়ির শেষে দু-দিকে দুটো ফ্ল্যাট। দীপু আন্দাজে একটার দরজায় ধাক্কা দিল।

একজন প্রৌঢ় মহিলা দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

রতনদা আছেন?

আপনি কোথা থেকে আসছেন?

প্রৌঢ়ার মুখখানি অপ্রসন্ন। দীপুকে তিনি পছন্দ করেননি, তার কারণ দীপু বয়েসে যুবক। অচেনা যুবকদের দেখতে আজকাল আর ভাল লাগে না। বিশেষ করে দুঃখিনী মায়েদের।

দীপু বলল, আমি আগে আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতাম—এখন থাকি সল্ট লেকে, রতনদার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

মহিলার মুখ দেখেই বোঝা যায় তিনি মিথ্যে কথা বলতে অভ্যস্ত নন। তবু তিনি রুক্ষভাবে বললেন, না, সে বাড়ি নেই।

মাস্টারমশাই আছেন?

তাঁর কাছে কী দরকার? মাস্টারমশাই অনেকদিন আগে আমার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, এমনি দেখা করতে এসেছি।

মহিলা এবার দরজা খুলে দিয়ে বললেন, উনি এই সময় কখনো বাড়ি থাকেন না। রতনের শরীর খারাপ, শুয়ে আছে, তুমি ওই ঘরে যাও।

তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, রতন, রতন।

দীপু পর্দা সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, রতনদা, একটু আসব?

খাটের ওপর পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে রতন একটা বই পড়ছিল। তার গালে আট দশ দিনের দাড়ি, চুল উশকোখুশকো, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে!

বইটা সরিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কে? ও, হ্যাঁ এসসা, বসো, ওই চেয়ারটা টেনে নাও। তোমার নামটা কী যেন, চেনা চেনা লাগছে–

আমার নাম দীপাঞ্জন!

বুঝেছি। দীপু তো! তুমি হঠাৎ?

রতন অসুস্থ হলেও তার গলায় দৃঢ়তা আছে। সে উঠে বসে দীপুর দিকে খরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দীপু কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না। সুতরাং কথার কথা হিসেবে বলল, আপনার শরীর খারাপ? জ্বর হয়েছে নাকি?

রতন প্রশ্নটাকে একেবারে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, ও কিছু না। তারপর তোমার খবর-টবর কি?

আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম।

আমার কাছে পরামর্শ? তুমি তো অন্য লাইনের ছেলে, আমি যতদূর জানি–

রতন হাত বাড়িয়ে দেয়ালের তাক থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাই নিয়ে ধরালো। একটা টান দিয়েই কাশতে লাগল।

দীপুর মনে পড়ল, বছর চারেক আগেও রতনদা খুব সাহেবি কায়দার মানুষ ছিলেন। দামি কাপড়জামা পরতেন, দামি সিগারেট খেতেন। কথায় কথায় ইংরেজি। মানুষটা অনেক বদলে গেছে এর মধ্যে। কোনো কোনো মানুষ বোধ হয় নিজেকে নষ্ট করতেও ভালোবাসে।

দীপু বলল, আমি খবর পেয়েছিলাম, আপনি জেল থেকে মাস খানেক আগে বেরিয়েছেন।

রতন একটা অবজ্ঞার মুখভঙ্গি করে বলল, আবার কবে ধরে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ধরুক। আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

না, না, আর ধরবে কেন? আপনার নামে তো কোনো চার্জ দিতে পারেনি।

চার্জ দেবার দরকার হয় না। যাক গে ওসব কথা। তোমার কী ব্যাপার বলো তো?

আপনি হঠাৎ চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেন?

নিজে তো ছাড়িনি। ওরা ছাড়িয়ে দিয়েছে।

দীপু বলল, তা হতেই পারে না। ওরা কি গ্রাউণ্ডে আপনাকে ছাড়াবে? আজকাল চাকরি এমনি ছাড়ালেই হল?

রতন কৌতূহলী হয়ে দীপুর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী? তুমি আমার চাকরির ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন?

দীপু একটু লজ্জা পেয়ে গেল হঠাৎ। আমতা আমতা করে বলল, না, মানে ওই অফিসে আমার একজন চেনা লোক আছেন–

কে?

শ্যামসুন্দর মিত্র।

হুঁ। বড়ো অফিসার। তাতে কী হয়েছে?

উনি বলেছিলেন যে, আপনি যতদিন জেলে ছিলেন, তখনও আপনার চাকরি যায়-নি– আপনার যা ছুটি ছিল তাতেই, কেননা কনভিকশান না হলে তো কিছুই করতে পারে না। আপনার পলিটিক্যাল ব্যাপার–

শোনো দীপু, এর মধ্যে অনেক মজার ব্যাপার আছে। চাকরি ওরা ছাড়ায়নি ঠিকই, আমি রেজিগনেশন দিয়েছি। আমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই কোম্পানি আমাকে চিঠি দিয়েছিল যে আমার সব ছুটি ফুরিয়ে গেছে, দশ দিন তারা সময় দিচ্ছে, এর মধ্যে জয়েন করতেই হবে। কোম্পানি আইনের দিক থেকে ঠিকই আছে। কিন্তু জয়েন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কেন?

আমার এখন সব জায়গায় চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। জেল থেকে ছাড়া পেলেও আমাকে লুকিয়ে থাকতে হয়। আমাদের পার্টি ভেঙে গেছে। এখন মগের মুল্লুক চলছে। আমাদের অফিস বেলেঘাটায়, ওই এলাকাটা এখন অন্য পার্টির হাতে। তারা আমাকে ওখানে ঢুকতে দেবে না।

ঢুকতে দেবে না মানে?

ওখানকার লোকাল লিডারের সঙ্গে আমি লোকমারফত যোগাযোগ করেছিলাম। উনি মহানুভব ব্যক্তি, উনি জানিয়েছেন, ওঁর পার্টি আমাকে ক্ষমা করতে রাজি আছে, কিন্তু আমি কোনোদিন আর বেলেঘাটায় ঢুকতে পারব না। অর্থাৎ, আমি বেলেঘাটায় গেলেই ওরা আমাকে খুন করবে।

রতনদা এ কখনো হয়?

এইরকমই তো হচ্ছে। কয়েকদিন আগে একজন ছেলেচোরকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল আর. জি. কর হাসপাতালের সামনে, কাগজে পড়েছিস তো? ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো। ছেলে চুরির কোনো কেসই নয় এটা। ও হচ্ছে আমাদের সুদর্শন, আমারই মতন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে—আর জি কর হাসপাতালের থার্ড ইয়ারের ছাত্র ছিল, আবার পড়াশুনো করতে চেয়েছিল। সেখানেও ওই একই ব্যাপার, পাড়ার লিডার বলেছে, রাজনীতি ছেড়ে আবার ডাক্তারি পড়তে চান আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু বেলগাছিয়ায়

বা শ্যামবাজারে ঢুকতে পারবেন না। বুঝে দেখো ঠ্যালা। ডাক্তারি পড়তে পড়তে ট্রান্সফার নিতে হলে মন্ত্রীর পারমিশন নিতে হয়—আমাদের দলের ছেলের কথা শুনবে কেন? সুদর্শন গোঁয়ারের মতন তবু গিয়েছিল শ্যামবাজার পেরিয়ে—সকলে মিলে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। জেলে থাকতে থাকতেই সুদর্শনের একটু মাথার দোষ হয়েছিল, ওর ধারণা হয়েছিল, নিজে ডাক্তারি পাস করে নিজের চিকিৎসা করবে

দীপু বিবর্ণ মুখে গুম হয়ে বসে রইল। এসব কি শুনছে সে? কলকাতা শহরেই এই সব ঘটে যাচ্ছে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, রতনদা, আপনি ভালো চাকরি করতেন, আপনি

এসবের মধ্যে ঢুকতে গেলেন কেন?

রতন উত্তরটা এড়িয়ে গেল। নিভে যাওয়া বিড়িটা ধরবার জন্য সময় নিল একটুখানি। তারপর বলল, তুমি বিজনকে চিনতে? আমার মামাতো ভাই–

দেখেছি কয়েকবার। হায়ার সেকেণ্ডারিতে স্ট্যাণ্ড করেছিল যে, সেই বিজন তো?

হ্যাঁ। সে মারা গেছে, জান?

অ্যাঁ?

ময়দানে তার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ মেরেছে। সে কেন যোগ দিয়েছিল বলো তো? জেলখানায় এখনো হাজার হাজার ছেলে পচছে—কেউ তাদের সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করে না এখন, কিন্তু তারা কেউই গুণ্ডা বদমাস নয়, প্রত্যেকেই ভালো ছেলে, আদর্শবাদী- তারা সব ছেড়েছুড়ে গিয়েছিল, ওঃ, দীপু, তুমি জান না, কী অবস্থায় তাদের রেখেছে— ভাবতে গেলেই আমার রক্ত গরম হয়ে যায়, আমি জেলের বাইরে এসেছি বলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়, সারাগায়ে চুলকুনি, খেতে দেয় না, মাঝে মাঝেই একটা কিছু ছুতো তুলে লাঠি পেটা করে কয়েকজনকে মেরে ফেলে।

কথা বলতে বলতে রতন বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েই হঠাৎ থেমে যায়। দীপু ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে? তা হলে মাকে বলতে পারি—জানি না বাড়িতে চিনি আছে কিনা।

না, চা খাব না।

দীপু, তোমার কখনো মনে হয়নি, সারাদেশজুড়ে এই যে অন্যায় চলছে, এ সম্পর্কে তোমারও কিছু করার আছে? কোনোদিন গ্রামে গিয়েছ? দেখেছ, সেখানে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে?

দীপু মুখ তুলে দুঃখিতভাবে তাকাল। তারপর বলল, আমি এই খুনোখুনির ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। গ্রামের লোকেরা খেতে পাচ্ছে না বলে রাস্তায় ঘাটে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি–

রতন গম্ভীরভাবে বলল, কখনো কখনো লাইন অব অ্যাকশান ভুল হতে পারে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্যটা মিথ্যে হয়ে যায় না।

কিন্তু ভুল স্বীকার করলেই তো মৃত্যুগুলো মুছে যায় না। মাঝে মাঝে যুব কংগ্রেস, সি পি এম, নকশাল এইসব আলাদা আলাদা নাম দিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় এতে মূলসমস্যার কী সমাধান হয় আমি বুঝি না! মায়ের সামনে ছেলেকে কিংবা ছাত্রদের সামনে মাস্টারমশাইকে খুন করে কতকগুলো মূল্যবোধও নষ্ট করে ফেলা হয়। রতনদা, চারদিকে তো শুধু ভুলই দেখতে পাচ্ছি।

রতন চেঁচিয়ে বলল, পরিষ্কার একটাই রাস্তা আছে–

এই সময় একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে বলল, দাদা, তোমাকে বেশি কথা বলতে বারণ করেছে।

মেয়েটির গায়ে একটা জীর্ণ ফ্রক। মুখে একটা রাগের ভাব। রতন বিরক্তভাবে হাত তুলে বলল, যা, ঠিক আছে। এই একটু চা করতে পারবি?

দীপু তাড়াতাড়ি বলল, রতনদা, আমি সত্যি চা খাব না।

রতন দীপুকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ। যা দু-কাপ চা নিয়ে আয়।

মেয়েটি চলে যাবার পর রতন হেসে বলল, তুমি না খেলে আমাকেও চা দেবে না। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকি, মা সবসময় ভয় পান আমি বুঝি আবার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ব। একটা কিছু চাকরি-টাকরির ব্যবস্থা করতে হবে, যদিও ইচ্ছে করে না–

চাকরি পাওয়া তো খুব শক্ত। আপনার পুরোনো চাকরিটা এমনিভাবে হারাবেন? ওখানে অন্য কোনোভাবে চেষ্টা করা যায় না? অন্য কোনো ব্রাঞ্চে যদি ট্রান্সফার করে–

না। ওখানে আমি রেজিগনেশান দিয়ে দিয়েছি। ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে, আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও পেয়ে গেছি।

দীপু খুব ইতস্তত করে বলল, ওখানে আমার যে একজন চেনা লোক আছেন, তিনি আমাকে ওই পোস্টটা দিতে চাইছেন।

রতন বলল, এতক্ষণে তোমার আসবার কারণটা বুঝতে পারলাম। আমার কাছে চাকরিটার ব্যাপারে জানতে এসেছ! নিয়ে নাও! কাজটা খুব শক্ত নয়–

না, আমি বলছিলাম–

তুমি নিজের মনে কাজ করে যাবে। ইউনিয়নের দলাদলির মধ্যে যেও না। সত্যেন তালুকদার বলে একজন লোক আছে, তাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলবে। একটা ডায়ারি বুক রাখবে সবসময়, টুরে গিয়ে–

দীপু ওকে বাধা দিয়ে বলল, রতনদা, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, চাকরিটা আমার নেওয়া উচিত কিনা।

কেন?

যে চাকরি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি আমার পক্ষে–

রতন এবার খোলা গলায় হো হো করে হাসল। হাসতে হাসতে তার কাশির দমক এল। রতন অসুস্থ এবং সবসময় ক্রুদ্ধ থাকে। সে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখন একটা উদারতা দেখানোর সুযোগ পেয়ে সে সত্যিই একটু খুশি হয়।

রতন সস্নেহে বলল, এইজন্য বুঝি তোমার বিবেকে কামড়াচ্ছে। দীপু, আমি তোমাকে খুব খোলা মনে বলছি, এ চাকরিটা নিয়ে তুমি আমার কোনো ক্ষতি করছ না। চাকরিটা আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। ওপাড়ায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি চাকরি পেলে আমি খুশিই হব। কি, ঠিক আছে?

দীপু মিনমিন করে বলল, আপনি যদি বলেন...

আমি তো বলছিই। তাড়াতাড়ি জয়েন করো। তোমার বুঝি চাকরির খুব দরকার? এতদিন কোথাও চেষ্টা-টেষ্টা করনি?

এতদিন করিনি, এখন অবশ্য আরো কয়েক জায়গায় চেষ্টা করছি।

ঠিক আছে, লেগে যাও। তবে, জান তো, সব চাকরিতেই কিছু কিছু ঝামেলা থাকে। সবচেয়ে ভালো হয়, চাকরি না করে থাকতে পারলে।

আমারও সেইরকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি, তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চাই–তার জন্য তো টাকা দরকার।

বিয়ে করছ?

এখনো ঠিক, মানে–

অর্থাৎ চাকরি পেলে তারপর বিয়ে করবে! তোমার তো খুব জরুরি সমস্যা দেখছি। ঠিক আছে, ব্যবস্থা তো হয়েই গেল। ওদের মাইনেপত্র মোটামুটি ভালোই। অবশ্য ওরাও এক্সপ্লয়টার, বলাই বাহুল্য।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না?

আমি আরও অনেক কিছু ছাড়বার জন্য তৈরি হচ্ছি।

সেই কিশোরী মেয়েটি এই সময় চা নিয়ে এল। শুধু চা। একটা চুমুক দিয়েই দীপু বুঝল, এত খারাপ চা সে বহুদিন খায়নি। চায়ের কোনো মাথামুনুই নেই। রতন অবশ্য সেটাই বেশ আরাম করে খাচ্ছে, দীপুর মনে পড়ল একদিনের কথা। রতন যখন এম এ ক্লাসের ছাত্র, দীপু তখন সদ্য ফার্স্ট ইয়ারে ভরতি হয়েছে, একদিন কফি হাউসে গিয়ে দেখেছিল, রতন সেখানে দুটো টেবিল জোড়া দিয়ে দশ-বারোজন বন্ধুকে কফি খাওয়াচ্ছে। স্কলারশিপ পেত রতন, খুবই শৌখিন প্রকৃতির যুবা ছিল। সে সত্যিই অনেক কিছু ছাড়ছে।

চা খেয়ে দীপু উঠে পড়ল। রতন তাকে এগিয়ে দিল দরজা পর্যন্ত। রতনের মুখ এখন অনেক প্রশান্ত।

রতনের মা সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্য একজন মহিলার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছিলেন। দীপুকে দেখে তিনি সরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দীপুর মনে হল, উনি কাঁদছিলেন একটু আগেই। চোখ সেইরকম। মেয়েদের কান্নার অনেক কারণ থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়, অন্ধকারে দীপু একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, একজন প্রৌঢ় লোককে উঠে আসতে দেখে সে সিগারেটটা লুকোলো, মুখ ফিরিয়ে রইল দেয়ালের দিকে।

প্রৌঢ় তার আপাদমস্তক লক্ষ করে প্রশ্ন করলেন, কে?

দীপু সিগারেটটা নীচে ফেলে দিয়ে লজ্জিতভাবে বলল, স্যার আমি।

নীচু হয়ে প্রণাম করল দীপু। প্রৌঢ় তাকে চিনতে পারলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, কে?

স্যার, আমি দীপাঞ্জন।

দীপাঞ্জন? দীপাঞ্জন কী?

দীপাঞ্জন সরকার। সিক্সটি থ্রির ব্যাচ। আপনি আমাকে বাড়িতে পড়াতেন।

প্রৌঢ় মুখখানা অনেক কাছে নিয়ে এসে বললেন, ও, দীপু? তাই বলো, চিনতে পারিনি আজকাল চোখেও ভালো দেখি না। তুমি হঠাৎ, কী ব্যাপার?

দীপু কাচুমাচু হয়ে বলল, এদিকেই এসেছিলাম, তাই ভাবলাম একবার আপনার এখানে... রতনদার সঙ্গে গল্প করে গেলাম।

এসো, আবার উঠে এসো, একটু বসবে।

না, স্যার, আজ অনেকক্ষণ বসেছিলাম, রাত হয়ে গেছে।

বসবে না! আচ্ছা, আর একদিন এসো—রবিবার, এ ছাড়া অন্য কোনোদিন তো আমি সময়ই পাই না—দুপুরে স্কুলে, সকালে আর সন্ধ্যে বেলা তিনটে টিউশনি... তুমি এখন কী করছ যেন? তোমাদের তো নিজেদের বিজনেস–

না তো। আমি কিছুই করছি না। চাকরি-টাকরি খুঁজছি–

বাবা ভালো আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

এরপর আর বেশি বাক্য বিনিময় হয় না। দীপু বিদায় নিয়ে তরতর করে নীচে নেমে এল। সিগারেটটা তখনও জ্বলছে, দীপু সেটা তুলে নিয়ে ফু দিয়ে ধুলো ঝেড়ে নিল, তারপর টানতে লাগল। একটা আস্ত সিগারেট প্রাণে ধরে ফেলে দেওয়া যায় না।

বাইরে এসে দেখল। গলির মোড়ে সেই ছেলেগুলো নেই এখন। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

রাস্তার উলটোদিকে তার অনুসরণকারী যে তখনও অপেক্ষা করে আছে, দীপু অবশ্য তা লক্ষ করল না।

দীপু এখন বাড়ির দিকে হাঁটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা অন্ধকার পাড়ায় এসে পড়ল। এখানে লোডশেডিং। অন্ধকারে হাঁটতে তার অসুবিধে হয় না। সে নিজের চিন্তায় মশগুল। কয়েক দিনের মধ্যেই তার জীবন অন্যরকম হয়ে যাবে। তাকে প্রত্যেকদিন অফিস যেতে হবে। তা হোক। শান্তাকে সে কাছে পাবে। শান্তা–

হঠাৎ দীপু থমকে দাঁড়াল। সে একজন স্বপ্ন-দেখা যুবক। অনেক সময়েই সে আপন মনে কথা বলে। যারা আপন মনে কথা বলে, তাদের স্থান-কাল জ্ঞান চলে যায়।

দীপু অনুচ্চ স্বরে বলল, না, আমি ওই চাকরিটা নেব না, কিছুতেই নেব না!

কথাটা বলার পর মুহূর্তেই তার কষ্ট হল। কষ্টের জন্য সে একটা সান্ত্বনা খুঁজতে চাইল। তখন তার ভেতর থেকে কেউ যেন বিষণ্ণভাবে বলল, কেন চাকরিটা নেবে না, দীপু? তুমি তো কোনো অন্যায় করছ না। তুমি রতনদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে, তিনি তোমাকে খুশিমনেই অনুমতি দিয়েছেন।

দীপু দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, তা হোক! এটা নেওয়া যায় না। মাস্টারমশাই যখন শুনবেন, তাঁর উপযুক্ত ছেলে ওইরকম একটা প্রতিষ্ঠিত চাকরি ছাড়তে বাধ্য হল, আর আমি সেটা নিয়ে নিচ্ছি, তখন তাঁর মুখের অবস্থা কীরকম হবে?

বাঃ, রতনদার চাকরি যাবার ব্যাপারে তো তোমার কোনো হাত নেই। রতনদা নিজেই দায়ী। তুমি ওই চাকরিটা না নিলে আর কেউ নেবে, তাতে রতনদার কোনো লাভ হবে?

ওসব জানি না। আমি নেব না, ব্যাস! আমি তো আরও অনেক জায়গায় দরখাস্ত পাঠাচ্ছি, আর একটা পেয়ে যাবই।

চাকরি পাওয়া কত শক্ত, তুমি জান! যদি এক বছর-দেড় বছরের মধ্যেও না পাও? শান্তা–

আঃ, কেন তর্ক করছ? আমি ওই চাকরি নিতে পারি না, কিছুতেই পারি না। আমার ভালো লাগছে না!

অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে অন্যদের অসুবিধে হয়। একজন পথচারীর সঙ্গে দীপুর ধাক্কা লাগল। সচেতন হয়ে সে হাঁটতে লাগল আবার।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একজন একলা যুবক। তার মুখ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তার মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন। নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। সৎ থাকার ইচ্ছেটাই বড় কথা নয়। তার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্ধকারে তার মুখমন্ডলে সেই কষ্টের ছাপ পড়ছে, যা আর কেউ দেখবে না।

৪. সিনেমা হলগুলিতে সন্ধ্যের শো

সিনেমা হলগুলিতে সন্ধ্যের শো শেষ হবার পর রাস্তায় থিক থিকে ভিড়। আড়াই ঘণ্টা অলীক সুন্দর জগতে কাটিয়ে আসার পর আবার রাস্তায়, ট্রাম-বাসে ওঠার জন্য ছোটাছুটি, ট্যাক্সির জন্য তিক্ততা। তবু খুব একটা ক্ষোভ নেই। বেশ তো সময় কাটল।

অধ্যাপক জয়ন্ত দাশগুপ্ত এ্যাণ্ড হোটেলের আর্কেডের নীচে দু-জন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে ঘোরতর তর্কে প্রবৃত্ত। অনেকক্ষণ আগে তাঁর ইচ্ছে ছিল টু-বি বাস ধরে বাড়ি ফেরার, এখন তার সে ইচ্ছেটা উবে গেছে, দেশের অর্থনৈতিক অবনতির কারণগুলি দেখিয়ে জোরালো সব যুক্তিতে তিনি প্রতিপক্ষকে প্রায় ঘায়েল করে এনেছেন।

বয়েসে তরুণতর সাংবাদিকটি কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বলল, এই মিনিস্ট্রির দ্বারা কিস্যু হবে না।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত হুংকার দিয়ে বললেন, শুধু এই মিনিস্ট্রি কেন, এ-রকম চোদ্দোটা মিনিস্ট্রি দিয়েও কিস্যু হবে না। গোটা সিস্টেমটাকে যদি না পালটানো যায়—এখনো আপনারা চোখ

বুজে আছেন!

অপর সাংবাদিকটিও গলা চড়িয়ে বলল, কিন্তু প্রোডাকশান যে তাতে বাড়বে, তার গ্যারান্টি কোথায়? সেই তো গমের জন্য আমেরিকার কাছে হাত পাততে হয়। শ্রমিক শ্রমিক বলে চেঁচালেই হল! আমেরিকা কিংবা জাপানের শ্রমিকরা কমিউনিজমের নামও উচ্চারণ করে না কেন?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত বললেন, আর কয়েকটা বছর সবুর করুন, আমেরিকার তো বারোটা বেজে এসেছে প্রায়।

এই সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল একটি অতিশয় সুন্দরী তরুণী। প্রসাধনে সে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে। তার রূপ যেন জায়গাটাকে আরও বেশি আলোকিত করে দিল।

ওর নাম উজ্জয়িনী, ভরত গুপ্তর ছোটো মেয়ে। উজ্জয়িনী লোরেটো হাউসে পড়ে, বেশ ভালো ছাত্রী এবং ব্যবহারে যেন সরলতার প্রতিমূর্তি। সত্যিই সরল, ভান নয়। ঐশ্বর্য এক ধরনের সরলতা এনে দেয়।

উজ্জয়িনীর সঙ্গে আরও তিনটি যুবতী ও দু-টি যুবক রয়েছে। উজ্জয়িনী কখনো একা কোনো ছেলের সঙ্গে কোথাও যায় না। বাড়ির নিষেধ নয়, সে নিজেই পছন্দ করে না। অনেকের মাঝখানে একাধিক পুরুষ তার তোষামোদ করলে সে বেশি আনন্দ পায়।

উর্দি পরা ড্রাইভার উজ্জয়িনীর জন্য বিরাট পটটিয়ার্ক গাড়িটার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। উজ্জয়িনী ঝলমলে সিল্কের আঁচল সামলাতে গিয়ে একবার ডান দিকে তাকায়। অদূরে দাঁড়ানো জয়ন্ত দাশগুপ্তর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত কথা বলবেন কি বলবেন না, তা বুঝতে পারলেন না। হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন, চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক, যাতে মেয়েটি না ভাবে যে তিনি ওর দিকে অশোভন দৃষ্টিপাত করেছেন। মেয়েটিকে তিনি চেনেন, মেয়েটিও চেনে তাকে, একদিন ওদের বাড়ির গেট দিয়ে ঢোকার সময় মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, জয়ন্ত দাশগুপ্ত চোখ নামিয়ে নিলেও উজ্জয়িনী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা মাস্টারসাব, ফ্রাঁসোয়া জিলো কি শেষ সময়ে পিকাসোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল? কোন কাগজে নাকি বেরিয়েছে, আমার এক বন্ধু বলছিল।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত উত্তর দিতে পারেননি। ফ্রাঁসোয়া জিলোর নাম তিনি শোনেননি কখনো। কাগজে ওইরকম খবর কখনো বেরোলেও তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। তিনি ওবাড়িতে কাগজ পড়তে যান বলেই তাঁকে ওই প্রশ্নটা করা হয়েছিল।

উজ্জয়িনী অনেক খোলামেলা স্বভাবের মেয়ে। আজ এখানে জয়ন্ত দাশগুপ্তকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই বলল, কি, ভালো?

একে তো সুন্দরী, তার ওপর অত বড়োললাকের মেয়ে যদি নিজে থেকে এ-রকমভাবে কথা বলে, তা হলে মন দুর্বল হবে না? জয়ন্ত দাশগুপ্তর মুখখানা গদগদ হয়ে গেল, বন্ধুদের ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, ভালো। আপনি ভালো তো?

আপনি কোনদিকে যাবেন? আপনাকে লিফট দিতে পারি।

না, না, তার দরকার নেই। আমি এখন এখানেই একটু...

গাড়িখানা বেরিয়ে যাবার পর জয়ন্ত দাশগুপ্ত আবার ফিরে এলেন তাঁর বন্ধুদের কাছে।

সাংবাদিকদের মধ্যে কারুর কারুর মুখ একটু আলগা হয়। নিজেদের পারিবারিক অবস্থার চেয়েও অনেক উঁচু সমাজের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে প্রায়ই মিশতে হয় বলে তাদের মুখে সবসময়ই একটা বিদ্রুপের হাসি লেগে থাকে।

সাংবাদিক দু-জনের মধ্যে রঘুনন্দন সেন বেশি অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া। অন্যজন, সুগত চক্রবর্তী এখনো একবারও বিদেশে যায়নি বলে একটু মনমরা হয়ে আছে।

রঘুনন্দন বলল, মালটা কে?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত অত্যন্ত সংকুচিতভাবে বললেন, এমনি চেনা-।

খুব বড়ো বড়ো সার্কেলে ঘুরছিস তো আজকাল?

সুগত কিছু একটা বলার জন্যই বলল, মনে হল ডানা দুটো কোথাও রেখে এসেছে। রঘুনন্দনদা এই মেয়েটাই ক্যালকাটা ক্লাবে প্রায়ই যায় না? খুব মাল খায়!

জয়ন্ত দাশগুপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত উত্তেজনায় বললেন, মোটেই না। তা হতেই পারে না।

রঘুনন্দন সরু চোখে তাকালো জয়ন্ত দাশগুপ্তর দিকে। কিন্তু তার মুখে একটা হাসি হাসি ভাব। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কী রে, তোর আঁতে ঘা লেগেছে মনে হচ্ছে? ছেলেবেলায় হার্ট থ্রব ছিল নাকি?

না, সেসব কিছু না। মেয়েটিকে আমি অন্যভাবে চিনি। মোটেই বাজে মেয়ে নয়, অনেক লেখাপড়া করেছে।

রাখ রাখ, এ-রকম অনেক মাগি আমার দেখা আছে! রঘুনন্দন এর পরেও আরও এমন দু-একটি বাক্য বলল, যা প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করা গেলেও ছাপার অক্ষরে এখনো স্থান পায়নি।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত আহত বোধ করলেন। তাঁর সুরুচি বোধে ঘা লাগে। সব কিছুই এ-রকম তির্যকভাবে দেখা ঠিক নয়। তিনি বন্ধু দু-জনকে ছেড়ে চলে যেতে চান। সুগত তাঁর হাত ধরে আটকে রাখে।

রঘুনন্দন তবু ওকে খোঁচা দেওয়ার ঝোঁকে বললেন, তুই জানলি কী করে যে ওই মেয়েটা ক্যালকাটা ক্লাবে মাতলামি করে না? তুই কোনোদিন ঢুকেছিস ক্যালকাটা ক্লাবে কিংবা গ্র্যাণ্ড হোটেলে?

একথা ঠিক, রঘুনন্দন বছরে আট-দশবার ক্যালকাটা ক্লাব বা গ্র্যাণ্ড হোটেলে ঢুকে প্রচুর আহারাদি ও মদ্যপান করে। সেজন্য অবশ্য কখনো তার একটি পয়সাও খরচ হয় না। অনেক কোম্পানির বাতিক আছে ওই সব জায়গায় প্রেস কনফারেন্স ডাকা।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত বললেন, তোরা সবাইকেই চিপ ভাবিস। ও কার মেয়ে জানিস?

কার?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত এবার একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, তিনি একটা ভুল রাস্তায় পা বাড়াচ্ছেন। অনেক সময় সামান্য মুখের কথাও অনেক বিপজ্জনক হয়। তাঁর স্নায়ুসমূহ তাঁকে নির্দেশ করতে লাগল, এখানে ভরত গুপ্তর নাম উচ্চারণ কোরো না।

তিনি শান্ত হয়ে বললেন, এখানে ওর বাবাকে কেউ চিনবে না। ওর বাবা একজন বড়ো সায়েন্টিস্ট, অনেকদিন ধরে বিলেতে আছেন।

ইতিমধ্যে গ্র্যাণ্ড হোটেলের দরজায় আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। এবার একটি পুরুষ।

পুরুষটির বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ, অত্যন্ত দামি ও কুরুচিপূর্ণ জমকালো ঝকমকে রঙের প্যান্ট ও সেইরকম শার্ট, মাথার চুল ফাঁপাননা, চোখ দুটি লালচে! সে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে এল, রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, গাড়ি? গাড়ি কাঁহা?

পুরুষটির পেছনে পেছনে হোটেলের একজন বেয়ারা চকচকে একটা কোট হাতে নিয়ে ছুটে এসে বলল, সাব, আপকা কোট–

কোটটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে পুরুষটি বলল, মেরা গাড়ি বোলাও, জলদি!

আরও তিন-চারজন পুরুষ, দেখলেই বোঝা যায় পূর্বোক্ত যুবকটির পারিষদ, হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে যুবকটির হাত চেপে ধরে বলে, এ ব্রীজমোহন, এ ব্রীজমোহন– আর সে চেঁচায়, মেরা গাড়ি বোলাও–

সব মিলিয়ে একটা নাটকের দৃশ্যের মতন তৈরি হয়। পথচারীরা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। নীতিবিশারদ মধ্যবিত্ত কেরানিরা একটু বিরক্তির ভুরু কুঁচকোয়।

ওই যুবকটির নাম ব্রীজমোহন। যারা সন্ধান রাখে তারা জানে কলকাতার হোটেলগুলির নৈশ জীবনে ইদানীং ব্রীজমোহনই এক নম্বর বিলাসী পুরুষ। পকেটে খুচরো না থাকায়

দু-জন বেয়ারাকে একবার একটা এক-শো টাকার নোট ছিড়ে অর্ধেক দিয়ে বলেছিল, এ লেও, তুম পচাশ, তুম পচাশ—এ গল্প শহরের প্রত্যেক বেয়ারা ও স্টুয়ার্ড জানে।

কোটিপতি আত্মারামের পুত্র এই ব্রীজমোহন। ব্যবসায়ী মহলের অনেকের ধারণা, আত্মারাম এক পুরুষে যা উপার্জন করেছে, ব্রীজমোহন তার অর্ধেক জীবনেই তা উড়িয়ে যেতে পারবে।

তবে, এত কম রাত্রে ব্রীজমোহনকে কেউ বেসামাল অবস্থায় দেখেনি কখনো। ব্রীজমোহন ভোগ করে এবং ভোগ করতে জানে। হলিউডের একজন নায়িকা কলকাতায় আসার পর যে কৌশলে তাকে ব্রজমোহনের সংরক্ষিত কামরায় আনা হয়েছিল, তার মধ্যে কোনো খুঁত ছিল না। দু-মাস বাদে সেই নায়িকার গর্ভপাতের সময় ব্রীজমোহন সুইস ব্যাঙ্কের চেকে ক্ষতিপূরণ পাঠিয়েছিল।

ব্রীজমোহন একমাত্র বিচলিত হয়ে পড়ে ভরত গুপ্তর কন্যা উজ্জয়িনীকে দেখলে। এমন আকুপাকু করে বুকের ভেতরটায় যে চট করে নেশা ধরে যায়, তখন আর মাথার ঠিক থাকে। তার বাবা একবার উজ্জয়িনীর সঙ্গে ব্রীজমোহনের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। উজ্জয়িনী তখন স্কুলের ছাত্রী, ভরত গুপ্ত সে প্রস্তাবে আমলই দেননি। রাগ করে ব্রীজমোহন অবিলম্বে বিয়ে করে একটি মোমের পুতুলকে, এক বছরের মধ্যে পুরোনো হয়ে যায় এবং ব্রীজমোহনকে নিরন্তর সুখসাগরে ভাসিয়ে রাখার জন্য সেই স্ত্রী তিন বছর বাদেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা যায়। বন্ধুরা ঈর্ষা করে ব্রীজমোহনের ভাগ্যকে, বাড়িতে পিছুটান বউ-ও রইল না, বংশধরও পাওয়া গেল, আবার বউয়ের সম্পত্তি ফালতু আশি লাখ এসে গেল হাতে।

উজ্জয়িনীকে দেখেই হোটেল থেকে ছুটে নেমে এসেছে ব্রীজমোহন। সে এখুনি গাড়ি নিয়ে তাড়া করতে চায়। বন্ধুরা তাকে নিবৃত্ত করছে, কারণ তারা জানে, ভরত গুপ্তর মেয়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার মানে আগ্নেয়গিরিতে ঝাঁপ দেওয়া।

বন্ধুরা ওর হাত ধরে টানাটানি করছে আর ব্রজমোহন গাড়ির জন্য চেঁচাচ্ছে—এ্যাণ্ড হোটেলের বারান্দার নীচে, রাত সাড়ে আটটায় এই দৃশ্য! এর মধ্যে আবার একগাদা ভিখিরি ওদের ঘিরেধরে দৃশ্যটা ঘোলাটে করে দেয়।

অল্প দূরে দাঁড়িয়ে তিনজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী এইসব দেখে। সুগত চক্রবর্তী ব্রীজমোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা মর্কট! দেখুন দেখুন, ঠিক বাঁদরের মতন হাত-পা ছুড়ছে।

হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলল রঘুনন্দন। তার মুখে তখনও চাপা হাসি। সে বলল, এই মর্কটরাই দেশটা কিনে রেখেছে। ও কে জানিস?

আপনি চেনেন?

চিনি চিনি। একেও চিনি, আগে যে মেয়েটা গেল তাকেও চিনি। জয়ন্ত যতই গুল মারার চেষ্টা করুক।

জয়ন্ত দাশগুপ্ত একটু কেঁপে উঠলেন। কথা ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, কোথায় যাবি বলছিলি, চল-না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না।

কেন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। খারাপ লাগছে?

এখানে দাঁড়ালে মনে হয়, এ শহরটা আমাদের নয়।

নয়ই তো। কে বলল আমাদের?

সুগত বলল, একটা কিছু করা দরকার।

রঘুনন্দন হো হো করে হেসে উঠে বলল, রক্ত গরম হয়ে গেল বুঝি? চল, চল, মাল খাই!

ওরা তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল একটি বিলিতি ধরনের গুঁড়িখানার সামনে। কিন্তু সেটা বড়ো বেশি প্রকাশ্য জায়গায় বলে অধ্যাপক জয়ন্ত দাশগুপ্ত আপত্তি করলেন। তখন

রঘুনন্দন ওদের নিয়ে এল আর এক জায়গায়, সেখানে ছাত্রদের যাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ দাম একটু বেশি।

ভেতরে সব কটি টেবিলই ভরতি। এই সময়ে সাধারণত ভরতিই থাকে। সকালে মাঝে মাঝে হরিণঘাটার দুধ আসে না, কিন্তু মদের অভাবে কোনোদিন কোনো বার বন্ধ থাকেনি।

কোনো টেবিল খালি না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে রঘুনন্দন। আটটার পর থেকেই তার গলা শুকোয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে একজন চেনা লোককে দেখতে পেয়ে বলল, চল, ওই টেবিলে বসা যাক।

তারপর সে জয়ন্ত দাশগুপ্তের কাঁধে টোকা দিয়ে সাবধান করে দিল, অন্য কারুকে অফার করতে যাসনি বোকার মতন।

সেই টেবিলের সামনে গিয়ে কোনো অনুমতি না নিয়েই বসে পড়ল রঘুনন্দন, অন্যদের বলল, চেয়ার টেনে বোস।

দ্রুত আলাপ-পরিচয় সম্পন্ন হল। সেই টেবিলে বসেছিলেন দু-জন লেখক। একজন খুবই জনপ্রিয়, অন্যজনও বেশ পরিচিত। ওঁরা দু-জন নিঃশব্দে মদ্যপান করছিলেন। জয়ন্ত দাশগুপ্ত লেখক দু-জনের নাম শুনে একটু চমকে উঠলেন। তিনি এঁদের অনেক লেখা পড়েছেন, কখনো চোখে দেখেননি। বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে আলাপ হলে একটু রোমাঞ্চ হয়ই। তিনি অবশ্য আশা করেননি এঁদের এইরকম জায়গায় দেখতে পাওয়ার।

তিনি মুখে কোনো উচ্ছাস প্রকাশ করলেন না। এমন ভাবও দেখালেন না যে, তিনি এঁদের কোনো বই পড়েছেন কিংবা নাম শুনেছেন! নমস্কার করলেন শুকনোভাবে।

জনপ্রিয় লেখকটি রঘুনন্দনকে প্রশ্ন করলেন, খবর-টবর কী? নতুন কিছু খবর আছে?

গলা শুকনো বলেই রঘুনন্দনের মেজাজ ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। সে বলল, রিপোর্টারদের দেখলেই বুঝি খবরের কথা মনে পড়ে? খবরে আপনাদের কি আসে-যায়? আপনারা তো বেশ আছেন!

বেশ আছি? বাঃ!

তা নয়তো কি? দু-হাতে লিখে যাচ্ছেন, আর টাকা পাচ্ছেন। দিন, বেয়ারাকে ডেকে একটা অর্ডার দিন।

অন্য লোকটি বেশি কথা বলেন না। তিনি চুপচাপ গেলাসে চুমুক দিয়ে যান।

প্রথম গেলাসটা খেয়েই রঘুনন্দনের মেজাজ বদলাতে শুরু করে। সে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে বলে যে, দাদা, গতবার পুজা সংখ্যায় যেটা লিখেছিলেন, সেটা একেবারে দুর্দান্ত। বাজারে দারুণ হিট করে গেছে। জয়ন্ত তুই পড়েছিস?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত দ্ব্যর্থবোধকভাবে মাথা নাড়লেন। ওই লেখাটার বিষয়ে তাঁর কিছু বলার আছে, কিন্তু এখনো সময় হয়নি।

রঘুনন্দন অন্য লেখকটির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার লেখাগুলো এখনো পড়া হয়নি, তবে শুনছি ছেলে-ছোকরারা খুব চেঁচামেচি করছে।

স্বল্পবাক লেখকটি ভদ্রতার আবরণে অবজ্ঞার হাসি হাসলেন।

রঘুনন্দন প্রথম সাহিত্যিকটির দিকে ফিরে আবার বলল, দাদা, একটা কথা বলব?

বলুন।

আপনারা এমন একটা কিছু লিখুন, যাতে সারা দেশে আগুন জ্বলে যায়। কী হচ্ছে দেশটার? কেউ কোনো প্রতিবাদ করবে না? আপনারা যদি মানুষকে পথ না দেখান–

জনপ্রিয় সাহিত্যিক জিজ্ঞেস করলেন, আগে কতটা খেয়েছ? এর মধ্যেই নেশা হয়ে গেল?

মোটেই নেশা হয়নি। আগে কিছু খাইনি। শুধু দুপুরে দু-বোতল বিয়ার খেয়েছিলাম। কিন্তু আমি কি বাজে কথা কিছু বলেছি?

মদের দোকানে এসে এসব কথা শুনতে ভালো লাগে না।

আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। আপনার দেখা আর কোথায় পাব?

তুমি যদি সাংবাদিক হিসেবে আমার ইন্টারভিউ নিতে চাও, তা হলে যেকোনোদিন আমার বাড়িতে আসতে পার।

রাগ করছেন কেন? হঠাৎ রাগ করছেন কেন?

সুগত হঠাৎ একটু ফাঁক পেয়ে বলল, সাংবাদিক নয়, মনে করুন, যদি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে কিছু জানতে চাই—মানে সাহিত্যিকদের কাছে আমাদের অনেক প্রশ্ন থাকে তো?

তিনি তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন সাংবাদিক দু-জনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সবাই এক-এক সময় সাধারণ মানুষ হয়ে যায়, শুধু সাহিত্যিকরাই হয় না। যে-যার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সাহিত্যিকদের কাঁধে সব দায়িত্ব চাপাও, এই তো?

জয়ন্ত দাশগুপ্ত গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। একথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে, আপনাদের লেখা পড়ে অনেক লোক ইনফ্লুয়েন্সড হয়। আপনারা যদি দেশের সমস্যাগুলোর অবজেক্টিভ দিকটা ঠিকঠাক দেখান–

জনপ্রিয় সাহিত্যিক আজ প্রথম থেকেই রেগে ছিলেন কোনো কারণে। তিনি কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনার পেশা কি? আপনিও কি সাংবাদিক?

না, আমি মাস্টার। একটা কলেজে অর্থনীতি পড়াই।

আশা করি আপনি অর্থনীতিটা বেশ ভালোই বোঝেন তা হলে। কিন্তু পরীক্ষার সময় প্রত্যেকবার কেন ছাত্ররা সব ভন্ডুল করছে এ প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই আপনি এ জন্য দেশের সরকার কিংবা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করবেন?

না, তা কেন? আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে।

এর দেড় ঘণ্টা পরে দেখা গেল ওই টেবিলের সকলেরই কমবেশি নেশা হয়েছে। তাঁরা অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে চীন, রাশিয়া ও আমেরিকা বিষয়ে তর্ক করছেন, তলোয়ারের মতন ধারালো বাক্যের কাটাকুটি হচ্ছে পরস্পরের যুক্তি। স্বল্পবাক লেখকটিও বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে খুব রাগারাগি করতে লাগল এবং দম্ভভরে বলতে লাগল, বেশ করব প্রেমের গল্প লিখব! পড়তে ইচ্ছে না হয় পোড়ো না!

জয়ন্ত দাশগুপ্ত তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, প্রেম প্রেম তো করছেন, কিন্তু আসল ব্যাপার তো অন্য। প্রেম অতিপবিত্র জিনিস হতে পারে, কিন্তু এইরকম সময়ে রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প লেখা মানে হচ্ছে, সব সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা।

অন্য লেখকটি উত্তর দিলেন, তা হলে ক্রিকেট, ফুটবল খেলা, মিউজিক কনফারেন্স এগুলো কী? এসবও বন্ধ হয়ে যাক!

বেশি নেশা করলেই রঘুনন্দনের চোখে জল আসে। সম্প্রতি কয়েকটা জেলা কভার করতে গিয়ে কী ভয়াবহ দারিদ্র্য সে দেখে এসেছে, সেই কথা বলে কাঁদতে লাগল। অনুজ লেখকটির কথাবার্তা এখন সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। সে ঘৃণার সঙ্গে বলল, এঃ, পুরুষ মানুষের কান্না দেখলে আমার বিচ্ছিরি লাগে! যাও, পেচ্ছাপখানায় গিয়ে কাঁদো! আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। বাঁচতে ইচ্ছেও করে না। সে অন্যদের কাঁধ ধরে বারবার ঝাঁকানি দিতে দিতে ওই একই কথা বলতে লাগল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এদেশে বেঁচে থেকে লাভ কী!

৫. পাঁচদিন ধরে কলকাতা বন্দরে ধর্মঘট

পাঁচদিন ধরে কলকাতা বন্দরে ধর্মঘট চলছে। ঘনঘন মিটিং হচ্ছে রাইটার্স বিল্ডিংসে। কয়েকজন নেতা চলে গেছেন দিল্লি। মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং-এ প্রখ্যাত এক নেপালি ভাষার কবির জন্মদিবস পালনে পৌরোহিত্য করতে গেছেন। সেখান থেকে বারবার টেলিফোনে খবর নিচ্ছেন।

কয়েকটি বিদেশি জাহাজ ডেমারেজ দেবার ভয়ে বন্দর ছাড়ব ছাড়ব করছে। দু-হাজার টন চা গুদাম বন্দি হয়ে আছে, অবিলম্বে জাহাজে তুলতে না পারলে বিদেশের বাজার নষ্ট হয়ে যাবে।

ধর্মঘটের মূল কারণটি অস্পষ্ট। প্রথমে শুরু হয়েছিল দু-টি প্রতিপক্ষ শ্রমিক দলের মধ্যে ছোটোখাটো দাঙ্গা। তারপর পুলিশ এসে পড়তেই সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এখন নানারকম কঠিন কঠিন দাবি দাওয়া উত্থাপিত হয়েছে।

ভরত গুপ্ত দোতালার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে সূর্যাস্তের শোভা দেখছিলেন। সারাদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, এখন বিদায় বেলায় সূর্যের লাল রঙে কোনো খাদ নেই। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক। কাকেরা মানুষের কাছাকাছি থাকে, কাছাকাছিই তাদের বাসা, তবু সন্ধ্যের দিকে তারা একবার আকাশে উড়ে খুব এক চোট ডেকে নেয়। এই সময় মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে আসে।

গণেশলাল নিঃশব্দ পায়ে এসে ভরত গুপ্তর সামনে দাঁড়াল। ডাকল না। ভরত গুপ্ত তবু টের পেলেন। তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললেন, বলো। গণেশলাল বলল, পোর্টের

স্ট্রাইক বোধ হয় কাল মিটে যাবে। ভরত গুপ্ত উদাসীনভাবে বললেন, কেন? আজ তো ঠিকই চলছিল।

হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। কিন্তু আসিফ সাহেব এখন আত্মারামজির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আত্মারামজি ইউনিয়ানের লিডারদের কাছে ফিলার পাঠিয়েছেন।

পাকা খবর?

হ্যাঁ। একদম পাকা।

কিন্তু ধর্মঘটটা যে আর তিনদিন অন্তত চালানো দরকার।

আমাদের কাছে আত্মারামজির কয়েকটা উপকার পাওনা আছে। তার বদলে এই পোর্টের ব্যাপারটা যদি উনি ছেড়ে দেন।

হুঁ। আসিফ এখনো কলকাতাতেই আছে?

জী?

চারজন লোক সবসময় যেন ওকে চোখে চোখে রাখে।

লোক লাগানো আছে। তবে, ওনার সঙ্গেও পাকা পাকা সব লোক আছে।

লক্ষ্য রাখবে, ও কখন কোথায় যায়। পার্ক সার্কাসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শোভন যদি এখনো কলকাতায় থাকে, তাকে একটা ধমক দেবে। তারপর বলো আর কী খবর আছে?

শালিমারের রেলওয়ে শেডে আমাদের যত মাল জমে আছে, সরকার থেকে নোটিশ এসেছে তা দু-দিনের মধ্যে খালাস করতে হবে।

ওখানে কত সরষে জমে আছে?

দু-লক্ষ টন। আরও আসছে।

খুচরো দাম কত উঠেছে?

পৌনে আট।

ন-টাকা পর্যন্ত দাম না চড়লে তো ছাড়া যাবে না।

সরকার বলছে মাল খালাস না করলে মিসা প্রয়োগ করবে।

তাতে অসুবিধে কী আছে? তুমি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

এই ব্যাপারে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে...

এই অবস্থায় কী করা উচিত বলে তোমার ধারণা?

স্যার, আমার তো মনে হচ্ছে, এবার বোধ হয়–

ভরত গুপ্ত পাশ ফিরে পুরোপুরি তাকালেন গণেশলালের দিকে। তারপর বললেন, তোমার কি ছুটি নেবার ইচ্ছে হয়েছে?

গণেশলাল ভয়ে ছোটো হয়ে গিয়ে বলল, না, না।

তা হলে এই সামান্য ব্যাপারে তোমার মাথা খোল না কেন?

তিনটে উপায় নেওয়া যায়। শালিমারের মজুরদের মধ্যে গন্ডগোল লাগাতে পারো। অথবা বর্ধমানে কিংবা বাঁকুড়ায় একজন এম এল এ খুন করাও। অথবা জুটমিলগুলোতে দাঙ্গা লাগাও। এর যেকোনো একটা হলেই দেখবে সরকার আর সব কিছু ভুলে সেটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজগুলোতে এই নিয়েই হইচই করবে। এর একটাও যদি না পার, তাহলে শালিমারের গোডাউনে আগুন লাগিয়ে দাও। সরষে আমি এখন কিছুতেই বাজারে ছাড়ব না। একটা কাজ অবশ্যই করবে, কোনো ভুল না হয়। চন্দননগর বা

ব্যান্ডেলের কাছে। একজন রেলের ড্রাইভারকে পাবলিক দিয়ে মার খাওয়াবে। যাতে সেদিনের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয়। তাতে গুডস ট্রেন মুভমেন্ট অন্তত তিনদিন বন্ধ থাকবে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

আর কিছু?

স্যার, পোর্টের ব্যাপারটায় যদি আত্মারামজি ওই আসিফ সাহেবকে জিতিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু আমাদের একটা বড়ো রকমের হার হবে।

পোর্টের ব্যাপারে আত্মারামের সঙ্গে আমার বাজি আছে। এ বাজিটাতে আমি জিতব। ওই আসিফকে আমি এখান থেকে তাড়াবই। মুম্বাইতে সোনা স্মাগলিং-এর ব্যাপারে ওর একচেটিয়া ক্ষমতা, কিন্তু কলকাতা ওকে ছেড়ে দিতেই হবে। টেলিফোনটা দাও তো!

দেয়ালের এক কোণে সাদা রঙের টেলিফোন। বিরাট লম্বা তার লাগানো, যতদূর খুশি টেনে আনা যায়।

গণেশলাল টেলিফোনটা এনে ভরত গুপ্তর পাশে রাখল। তিনি রিসিভার তুলে বললেন, আত্মারামকে দাও তো।

কিছুক্ষণ পরে ওপাশ থেকে উত্তর এল, স্যার, আত্মারামজিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ভরত গুপ্ত এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, ময়দানে রাজস্থান টেন্টে দেখো। ওখানে পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক সেখানেই পাওয়া গেল। ভরত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, আত্মারামজি, খেলার খবর কী? সব খেলা ঠিকঠাক হচ্ছে?

আত্মারাম বিগলিত হাস্যে জানালেন, আরে ভরত গুপ্তাজি? কেয়া সারপ্রাইজ! আপনি কোন খেলার কথা জিজ্ঞেস করছেন?

তুমি যে খেলা ভালোবাসো।

আমি তো এক সঙ্গে অনেক খেলা খেলছি। বড়ো বড়ো মহাত্মারা সব বলে গেছেন, জীবনটাই একটা খেলা।

আপাতত ফুটবল খেলার কথাই হোক। কাল আপনার টিমের খেলা আছে না?

হ্যাঁ, কাল লিগের শেষ খেলা। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। কাল তো আপনারা জিতেছেন।

হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ ...

কি, জিতবেন না?

ইস্টবেঙ্গল এবার একটা খেলাতেও হারেনি।

তাতে কী হয়েছে, আপনারা হারাতে পারবেন না? ভালো করে খেলোয়াড়দের মদত দিন।

ভরত গুপ্তাজি, আপনার ফুটবল খেলায় আগ্রহ হল কবে থেকে!

আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার টিমটাকে জিতিয়ে দেওয়া।

ড্র ভি হবে না। ড্র হলেও এক পয়েন্ট পাওয়া যেত। তাহলে টিমটাকে বি ডিভিশনে

নামাতে পারত না।

এক পয়েন্ট পেলেই আপনার চলবে?

ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে? এর থেকে সাপের মুখে চুমু খাওয়া সহজ।

আত্মারামের মতন বহুদর্শী লোকও এই কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন গুপ্তাজি, আপনি এ নিয়ে বাজি ধরতে চাইছেন?

ভরত গুপ্ত ঠাণ্ডাভাবে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত?

শুনুন, শুনুন।

আপনি বাজি ধরতে ভয় পাচ্ছেন?

না, না, সে-কথা হচ্ছে না। আপনি রাজস্থান টিমকে জেতাতে চাইছেন?

আমি কি কখনো আপনার উপকার করি না?

কিন্তু অচানক এ-রকম একটা ব্যাপারে হলে আমি আপনাকে এক গাড়ি আতর ভেট পাঠাব।

আপাতত আমার আতরের প্রয়োজন নেই। আপনি জানেন, বাজি ধরা আমার নেশা।

বৃষ্টির বাজিটা বড় কাঁচা ধরেছিলেন।

আত্মারামজি, মাঝে মাঝে হারতেও আমার ভালো লাগে।

ঠিক আছে, কত?

পাঁচ লাখ।

পাঁ–চ –লা- খ!

পছন্দ হল না? তাহলে, দশ লাখ?

আপনি কী বলছেন?

আমি এক কথা দু-বার বলি না। রাজি?

রাজি। ক্যাশ। টার্মস কী হবে?

ইস্টবেঙ্গল হারবে। কিংবা খেলা ড্র হবে। মোট কথা, রাজস্থান ক্লাব এবার বি ডিভিশনে নামবে না। তৃতীয়টাই বাজির শর্ত!

ঠিক আছে। রাম, রাম।

না, শোনো, আর একটা কথা আছে। তোমার ছেলে ব্রীজমোহনকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে? তার সঙ্গে একটু কথা বলব।

সে কুলাঙ্গারটির সঙ্গে আপনি আবার কী কথা বলবেন?

না, না, কুলাঙ্গার কেন হবে? সে তো ব্যাবসাপত্তর ভালোই করছে। আমার ছোটো মেয়েটির বিয়ে দেবার কথা ভাবছি।

আচ্ছা এ ব্যাপারে পরে কথা হবে। আমি একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসিফ সাহেব আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে যদি একটা মিটমাট করা যায়–

ভরত গুপ্ত মুহূর্ত দেরি না করে কণ্ঠস্বরে বিস্ময় না ফুটিয়ে বললেন, আসিফ? সে আবার কে?

মুম্বাইয়ের লুৎফর আসিফ। আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল।

ঠিক মনে পড়ছে না। আচ্ছা, এসব নিয়ে পরে কথা হবে। রাম রাম!

শুনুন, শুনুন এটা খুব জরুরি ব্যাবসার কথা। আসিফ সাহেবকে আপনার মনে পড়ছে না?

এখন ব্যাবসার কথা রাখুন। খেলাধুলোর কথা হচ্ছে, এর মধ্যে আবার ব্যাবসা কেন?

আপনার রাজস্থান টিম তাহলে এবার বি ডিভিশনে নামছে না!

আপনি কি দশ লাখ বললেন? পুরো দশ লাখ?

আজকাল কানে কম শুনছেন নাকি?

ঠিক আছে। রাম, রাম।

টেলিফোন রেখে দিয়ে ভরত গুপ্ত ডান হাতের তর্জনীটি কপালে ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন এক মিনিট। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে পড়তে পড়তে বললেন, পরশুদিন ইস্টবেঙ্গল টিম মারডেকায় খেলবার জন্য কুয়ালালামপুর যাচ্ছে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। কালকেই লিগের শেষ খেলা। সুতরাং কালকের খেলা যদি ভেস্তে যায়, এটার আর মীমাংসা হবে না। রাজস্থান ঝুলে থাকবে, বুঝলে?

গণেশলাল বিহ্বলভাবে বলল, হ্যাঁ স্যার।

ইস্টবেঙ্গলের ছেলেগুলো কেমন?

গণেশলাল একটুও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্যার, খেলার লাইনের ছেলেগুলো খুব তেজি। ওদের হাত করা খুব শক্ত।

ওদের টাকার দরকার নেই?

তা আছে, কিন্তু মানে, টাকা দিয়ে ওদের দল ভাঙানো যায় সিজনের গোড়ায়, কিন্তু একবার খেলতে নামলে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন কিছু মনে রাখে না। টাকা খেয়েও কিছু করবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার। তা ছাড়া, ওদের পাহারা দিয়ে রাখে। টাকা দিয়ে যদি কিছু হত, তাহলে গণেশলালজি কি আর চেষ্টা করতেন না?

ভরত গুপ্ত এক ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বড়ো বেশি কথা বল! কাল ইস্টবেঙ্গল একটাও গোল দেবার আগেই খেলা বন্ধ করতে হবে। করতেই হবে। যে রেফারি থাকবে, তার চা, দুধ কিংবা জলের গেলাসে দশ ফোঁটা লাইসারজিক অ্যাসিড মিশিয়ে দেবে যেকোনো উপায়ে—তারপর সে আর মাথার ঠিক রাখতে পারবে না। প্রথমবার ভুল করা মাত্রই সবুজ গ্যালারি থেকে দশজনকে নামিয়ে দেবে মাঠে, থান ইট নিয়ে। একজন লোককে ঠিক করবে, সে মাঠের বাইরে থেকে সোজা ছুটে গিয়ে রেফারির নাকে ঠিক এমনি করে প্রচন্ড এক ঘুষি মারবে।

ভরত গুপ্ত তাঁর বিশাল হাতটা গণেশলালের দিকে ঘুষির ভঙ্গিতে তুলে বললেন, ঠিক এমনি করে—

গণেশলালের ফর্সা মুখখানা ভিজে কাগজের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবু সে বলল, আচ্ছা!

গণেশলাল জানে, এই পরিকল্পনার একটু এদিক-ওদিক হলে তার নিয়তি কোন দিকে যাবে।

ভরত গুপ্ত বললেন, এই খেলার বাজিটায় আত্মারামকে হারিয়ে বড়ো কিছু হবে না। ক্ষতি হবে না আত্মারামের, সে এর মধ্যেই সাইড বেট লাগিয়ে অনেক বেশি টাকা তুলে নেবে। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত রাখা যাবে তাকে। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত—একটুক্ষণ ফাঁকা পেলেই, একটা কিছু অর্থ চিন্তা করে নেয়। কাল আত্মারাম যখন খেলার মাঠে থাকবে, সেই সময় ব্রীজমোহনের গাড়িতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তাতে ব্রীজমোহন মারা না গেলেও পঙ্গু হয়ে থাকবে অনেকদিন। তুমি শুনেছ বোধ হয়, পরশুদিন একটা সিনেমা হলে সে উজ্জয়িনীর কাঁধে হাত রেখে কথা বলার চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ ভরত গুপ্তর মুখখানা ক্রোধে লাল হয়ে গেল। ঠোঁটে একটা ভয়ংকর ধরনের হাসি ফুটিয়ে বললেন, একটা গিড়ধরের বাচ্চা, তার এত সাহস! আমার মেয়ের গায়ে যে হাত ছোঁয়াতে সাহস করে, তার শাস্তি কি তুমি জানো?

গণেশলাল শুধু ঘাড় হেলালো। তারপর মৃদু গলায় বলল, কিন্তু কলকাতা পোর্টের স্ট্রাইকের ব্যাপারটা কী হবে?

ভরত গুপ্ত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বোঝাই যায়, তিনি ক্রোধ দমন করার চেষ্টা করছেন। কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি কদাচিৎ এ-রকম গলা চড়িয়ে কথা বলেন। ব্যাবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হলেও তাঁর এ-রকম উত্তেজনা দেখা যায় না।

একটু বাদে তিনি বললেন, তুমি বলছিলে গণেশ পোর্টের ব্যাপারটা নাকি?

ওটা সম্পর্কে চিন্তা করার এখনো সময় আসেনি। দেখোই না আগে আত্মারাম কতদূর কী করে। যাক, অনেক কাজের কথা হল। এবার বলো, সেই লোকটিকে খুঁজে পেলে?

এই প্রসঙ্গটি এলেই গণেশলাল স্পষ্টতই বিরক্ত বোধ করে। কর্তার এই এক ছেলেখেলার বাতিক আছে, যার সঙ্গে ব্যাবসার কোনোরকম সম্পর্ক নেই।

সে বলল, সেরকম তো কাউকে এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক লোক লাগিয়েছি।

কী আশ্চর্য, আমি যেমন চাই, সেরকম একটা লোকও কি কলকাতা শহরে নেই? বাঙালি জাতটা কি মরে গেল?

কেউই তো শেষপর্যন্ত টিকছে না। লোভ ছাড়া কি মানুষ হয়? তিনজনকে বাছাই করে রাখা হয়েছে, তাদের পেছনে সব সময় লোক ঘুরছে, এখনো পুরো রিপোর্ট আসেনি।

তারা কে কে?

একজন ইউনির্ভাসিটির মাস্টার, একজন বেকার ছোকরা আর একজন, আর একজন, খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন পুলিশ অফিসার।

ভরত গুপ্ত সহাস্যে বললেন, আশ্চর্য হবার কী আছে? পুলিশের লোক ভালো হয় না? মানুষ চিনতে তোমার এখনো অনেক দেরি আছে। এমন কিছু কিছু লোক থাকে, যারা টাকাপয়সার চেয়েও নিজেদের অহংকারটা পুষে রাখতে ভালোবাসে। আবার কেউ কেউ থাকে, যারা সবসময়ই অন্যদের থেকে আলাদা হতে চায়। অন্যদের সমান হতে গেলেই তাদের গা জ্বালা করে। আশেপাশে সকলে ঘুষ নিলে অমনি সে ভাবে, আমি নেব না! তার মানে অবশ্য এই নয় যে ওরা কখনো অন্যায় করে না কিংবা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না। ওর অহংকারে একটু সুড়সুড়ি লাগিয়ে দেখো কী হয়। আর ইউনিভার্সিটির মাস্টারটির যদি কোনো ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের দিয়ে কিছু অন্যায় করিয়ে দেখো উনি তখন কী বলেন। অনেক লোক আছে, যারা নিজেরা অন্যায় করে না, কিন্তু ছেলেমেয়ের অন্যায় সহ্য করে। সে ব্যাপারে অন্ধ। আর বেকার ছোকরা, ওকে একটা চাকরি, না, না বেকারকে চাকরির লোভ দেখাবার কোনো মানে নেই—বরং ওর কোনো চাকরি পাবার সুযোগ এলেই সেটা কেড়ে নেবে। কয়েকটা খুচরো পকেট মার লাগিয়ে দাও ওর পকেটে পয়সা থাকলেই যাতে তুলে নেয়–। পলিটিশিয়ানদের মধ্যে খোঁজ করেছ?

মিথ্যে কথা বলে না, এমন একজনকেও পাইনি।

তবু লেগে থাকো, ছাইগাদার মধ্যেও অনেক সময় রতন মেলে।

ভরত গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। তারপর গণেশলালের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, টায়ারের এজেন্সিটা তোমার নামে লিখিয়ে দেব। ওর থেকে যা লাভ হবে সব তোমার।

গণেশলাল একেবারে বিগলিত হয়ে বলল, আপনি তো আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমার যা-কিছু সবই তো আপনার দেওয়া।

ভরত গুপ্ত বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যে ছেলের বেনামীতে সিমেন্ট নিয়ে আলাদা ফাটকা খেলছ, সেটা এখন থেকে বন্ধ করে দাও। হঠাৎ আমি একদিন সিমেন্টের দর নামিয়ে দিলে তুমি মারা পড়বে। আমি যা পারি, তুমি তা পার না।

থতমতো খেয়ে গণেশলাল প্রায় তোতলা হয়ে গেল। হাত কচলাতে কচলাতে বলল, স্যার, আমি তো, আমি আপনার নিমক খাই, আমি যদি কোনোদিন আপনার সঙ্গে বেইমানি করি...

ভরত গুপ্ত তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, আমার আড়ালে সিমেন্টের ফাটকা বাজি খেলে তুমি আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করেছিলে! কিন্তু ভুলে যাও কেন, সব খবরই আমার কানে আসে। মনে রেখো ওই ব্যাপারে আমিই তোমাকে বাঁচিয়েছি–।

গণেশলালকে সেখানে স্তম্ভিতভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে ভরত গুপ্ত এগিয়ে গেলেন।

একটা ঘরের সামনে দিয়ে তিনি যেতেই ভেতর থেকে গালাগালি ছুটে এল, এই শালা ভরত! এই হারামির বাচ্চা!

ভরত গুপ্ত সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশলালের দিকে তাকালেন। গণেশলাল দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ভরত গুপ্ত তারপর শান্তভাবে বললেন, কী চাচাজি?

ঘরটা দরজার বাইরে থেকে তালাবদ্ধ। এক পক্ককেশ বৃদ্ধ ছুটে এল জানলার কাছে। সেখান থেকে আবার বলল, এই হারামির বাচ্চা, আয় তোর মুন্ডুটা ছিড়ে নিই!

জানলার গরাদ ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে সেই উন্মাদ বৃদ্ধ, হঠাৎ দেখলে জেলখানার কথা মনে হয়। ভরত গুপ্ত জানলার খুব কাছে এসে বললেন, আপনার কিছু কষ্ট হচ্ছে।

পাশের ঘর থেকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেহরক্ষীটি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখলে মনে হয় সে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এল।

বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে ভরত গুপ্তর মুখটা খিমচে দেবার চেষ্টা করতেই ভরত গুপ্ত তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিলেন। তবু এরপর নরমভাবে বললেন, চাচাজি আপনার ব্যথা কি বেড়েছে। ডাক্তারকে খবর পাঠাব?

কাছে আয় কুত্তীর বাচ্চা, তোর জান আমি নিকলে দেব। আয়! ডরপুক! কাছে আসিস না কেন?

ভরত গুপ্ত চোখ দিয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেহরক্ষীকে ইঙ্গিত করলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে মস্তবড়ো একটা সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। তালা খুলে ঢুকল ঘরে। তারপর, মনে হল যেন সেখানে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বৃদ্ধটি দু-হাত চালিয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানটিকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে আর সারাবাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচাচ্ছে। দেহরক্ষীটি অসীম বলশালী, একসময় সে বৃদ্ধকে জাপটে ধরে বাহুতে ঘ্যাঁচ করে ঢুকিয়ে দিল ইঞ্জেকশনের ছুঁচ। অবিলম্বে নিস্তেজ হয়ে এল বৃদ্ধের চিৎকার।

ভরত গুপ্তর শয়ন কক্ষের এত কাছে এইরকম একজন উন্মাদকে রাখা একটু বিসদৃশ মনে হতে পারে। কিন্তু এই উন্মাদটি অত্যন্ত মূল্যবান, ভরত গুপ্ত এঁকে চোখের আড়াল করলে দিতে চান না। আরও মুশকিলের ব্যাপার, উন্মাদরা সাধারণত দীর্ঘজীবী হয়।

ভরত গুপ্ত নীচে না নেমে উঠে গেলেন ওপরের সিঁড়িতে। তিনতলায় তাঁর স্ত্রীর মহলে এলেন।

তাঁর ছেলেরা কেউ এ বাড়িতে থাকে না। তাদের জন্য আলাদা অনেক বাড়ি আছে। শুধু তাঁর এক ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে গেছে বলে সেই পুত্রবধু এখন এ বাড়িতে, ওদের যমজ শিশু দু-টি ভরত গুপ্তর খুব প্রিয়। তাদের জন্য ইংরেজ গভর্নেস রাখা হয়েছে।

ভরত গুপ্ত এলেন তাঁর মেয়ে উজ্জয়িনীর ঘরে। এই সন্ধ্যেবেলাতেও উজ্জয়িনী বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। দুধের মতন সাদা নরম বিছানা, এই ঘরের বিছানার চাদর থেকে খাট আলমারি পর্যন্ত প্রত্যেকটি আসবাব বিদেশি।

দু-দিন ধরে উজ্জয়িনী বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে না। ভালো করে খেতেও চাইছে না। ব্রীজমোহন তার অঙ্গ স্পর্শ করায় সে খুবই অপমান বোধ করেছে। ভরত গুপ্ত এ খবর আগে পেয়েও এ দু-দিনের মধ্যে মেয়েকে সান্ত্বনা জানাতে আসেননি। আজ ব্রীজমোহনের অ্যাক্সিডেন্টটা যাতে নিছক অ্যাক্সিডেন্ট না মনে হয় সেই জন্যই তিনি আত্মারামকে টেলিফোনে একবার ব্রীজমোহনের নামটা শুনিয়ে দিলেন।

ভরত গুপ্ত উজ্জয়িনীর মাথার পাশে খাটে বসে পড়ে তার চুলে হাত দিয়ে সস্নেহে ডাকলেন, ফুলকুমারী।

উজ্জয়িনী অশ্রুমাখা মুখটা ফেরালো।

সপ্তাহে মাত্র একবার ছাড়া ভরত গুপ্ত ওপরে কখনো আসেন না।

আজ এসেছেন শুধু উজ্জয়িনীর জন্য। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখেই উজ্জয়িনীর রাগ অর্ধেকটা জল হয়ে এল। তা ছাড়া বাবা তাকে ছেলেবেলার আদরের নামে ডেকেছেন।

সে উঠে বসে বাবার বুকে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল আবার। এই কান্নার মধ্যে খানিকটা আদর আছে।

ভরত গুপ্ত বললেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। কাঁদিস কেন!

উজ্জয়িনী বলল, আর একটুখানি কেঁদে নিই। তারপর আর কাঁদব না।

উজ্জয়িনী ফোঁপাতে লাগল, আর ভরত গুপ্ত হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার রেশমের মতন নরম চুলে।

উজ্জয়িনী এক মিনিট পরে মুখ তুলে বলল, তুমি কী ব্যবস্থা করেছ?

ভরত গুপ্ত সস্নেহে বললেন, তা তোর জানার দরকার নেই। ব্রীজমোহন আর কোনোদিন তোকে ছুঁতে পারবে না।

ব্রজমোহন একটা মাকড়সার মতন নোংরা!

ফুলকুমারী, তোকে একটা কিছু উপহার দিতে চাই। তোর কি চাই বলতো?

উজ্জয়িনী চট করে কিছু বলতে পারল না। এই এক ট্র্যাজেডি।

যাদের সবই আছে, তাদের চাইবার জিনিস সহজে মনে পড়ে না। বাড়ি, গাড়ি, গয়না– এসবই তো উজ্জয়িনীর আছে। অনেক ভেবেচিন্তে সে বলল, আমাকে আর একটা মিংক কোট আনিয়ে দিও!

একটা খাঁটি মিংক কোটের দাম বিদেশি মুদ্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মতন। উপহারের জন্য টাকাটা অতিসামান্য, তবে একটু দুর্লভতার গুণ আছে।

ভরত গুপ্ত বললেন, ঠিক আছে, এ সপ্তাহেই আনিয়ে দেব এখন। নে, তুই এখন চোখের জল মুছে ফেল তো!

উজ্জয়িনী বলল, তুমি মুছিয়ে দাও।

তারপর সে প্রেমিকার মতন মুখখানি তুলে ধরল। উজ্জয়িনীর অন্যান্য অনেক ছেলে বন্ধু। থাকলেও বাবাই এখনো তার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। বাবার মতন পুরুষ মানুষ আর কে?

ভরত গুপ্ত ঠোঁট দিয়ে উজ্জয়িনীর গাল থেকে চোখের জল মুছে নিলেন।

তেইশ বছরের উজ্জয়িনী তখন যেন তিন বছরের শিশু হয়ে গেল। সে বাবার কোলে চড়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বড্ড রাগ হয়। তুমি একদম আর আমার কাছে আস না। তুমি আর আমাকে একটুও ভালোবাসো না।

ভরত গুপ্ত মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, একদম যে সময় পাই না।

সবসময় বুঝি কাজ! একটু ছুটি নিতে পার না?

আমার ছুটি নেই। তুই এক কাজ কর, তোর তো এখন কলেজ ছুটি, তুই সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে আয়-না কয়েকদিনের জন্য! তোর মন ভালো হবে।

উজ্জয়িনী উৎসাহিত হয়ে উঠে বলল, হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়। তুমিও যাবে তো আমার সঙ্গে?

না রে, আমি কি করে যাব। তুই যদি কোনো বন্ধু-টন্ধু সঙ্গে নিতে চাস–

না, তুমি না গেলে আমি যাব না।

দূর পাগলি, আমি কী যেতে পারি এখন!

বাবা আর মেয়ে যখন ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রকার বাক্যালাপ করছিল সেই সময় ভরত গুপ্তর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। স্বরূপা দেবী একজন কোটিপতির স্ত্রী হলেও সবসময় একটা সাধারণ সাদা তাঁতের শাড়ি পরে থাকেন। এই ছোট্টোখাট্টো মহিলাকে বাড়ির সকলে বাঘের মতন ভয় করে।

বাল্যকালের অভ্যেস মতন তিনি এখনো স্বামীকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। তিনি বললেন, কী ব্যাপার, আপনি আজ হঠাৎ ওপরে এলেন যে?

ভরত গুপ্ত লাজুকভাবে হেসে বললেন, মেয়েকে একটু আদর করতে ইচ্ছে হল।

স্বরূপা দেবী বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আজ থাক। উজ্জয়িনী, তুমি যাও, এবার ওঠো, স্নান করে এসো এখুনি।

উজ্জয়িনী বিনা প্রতিবাদে উঠে এল। বেশবাস ঠিক করে, মায়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল স্নানের ঘরে। উজ্জয়িনী যাবার সময় পাছে তাঁর সঙ্গে ছোঁয়া লাগে, তাই স্বরূপা দেবী একটু সরে দাঁড়ালেন।

স্বরূপা দেবী বললেন, তুমি মেয়েকে বড্ড বেশি আদর দিচ্ছ। মেয়েমানুষের এত আশকারা ভালো নয়।

ভরত গুপ্ত দুর্বলভাবে বললেন না, না, আমি আর কী আশকারা দিই! মেয়ে তো তোমার সামনেই আছে। ব্রজমোহন ওর মনে কষ্ট দিয়েছে।

এবার ওর শাদির ব্যবস্থা করো।

সেরকম যোগ্য ছেলে কোথায়?

ভরত গুপ্ত যেন কী একটা কারণে স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না। মুখ অন্যদিকে ফেরানো। স্বরূপা দেবী কিন্তু চেয়ে আছেন সোজাসুজি।

তিনি স্বামীকে বললেন, কাল সকালে আমি কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিতে যাব। সেইজন্য আপনাকে খবর পাঠাব ভেবেছিলাম। এই সময় ওপরে শুনতে পেলাম আপনার গলায় আওয়াজ। আমি ভাবতেই পারিনি, বিশেষ করে আজ শুক্রবার–

ভরত গুপ্ত দারুণ চমকে উঠে বললেন, আজ কী বার? মোটেই শুক্রবার না, আজ লক্ষ্মীবার।

না, আজই শুক্রবার।

ভরত গুপ্ত দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। তারপর গর্জন করে উঠলেন, কী। ভুল করেছি! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! কটা বাজে? সাতটা?

ভরত গুপ্ত লাফিয়ে নামলেন খাট থেকে। দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে।

স্বরূপা দেবী দু-হাত দিয়ে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ থাক-না। আজ তো ভুলেই গিয়েছিলেন।

নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখ-চোখ সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি এখন পৃথক মানুষ। এক হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছেন মাথার চুল। মুখ দিয়ে একটা কোনো আহত হিংস্র জন্তুর মতন আওয়াজ বেরুচ্ছে।

ভরত গুপ্ত ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে সরিয়ে দিলেন। ছুটে নীচে নামতে নামতে চিৎকার করতে লাগলেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল!

এই সময় বাড়ির দোতলা, একতলার সিঁড়ির মুখে কোলাপসিবল গেটগুলোতে তালা বন্ধ। প্রহরীরা সবাই একতলার একটা ঘরে চুপ করে বসে আছে।

ভরত গুপ্ত দোতলার লোহার গেট ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে হুংকার দিতে লাগলেন, দরজা খোলো! শিগগির দরজা খোলো!

তাঁর হুকুম শুনতে কেউ এল না। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ।

খানিকক্ষণ গেট খোলার নিষ্ফল চেষ্টা করে ভরত গুপ্ত আবার দৌড়ে চলে এলেন নিজের শোবার ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। তারপর দেওয়ালে প্রচন্ড জোরে মাথা ঠুকতে লাগলেন আর হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাতে লাগলেন, মা, মা, তুমি কোথায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

সেই সময় ভরত গুপ্তকে দেখলে মনে হবে ঠিক বদ্ধ উন্মাদ।

শুক্রবার সাতটা তিন মিনিটের সময় ভরত গুপ্তর জন্মক্ষণ। প্রত্যেক শুক্রবার এই সময়ে আধ ঘণ্টার জন্য তিনি পাগল হয়ে যান।

এরা পাগলের বংশ।

৬. দরজা খুলেই ছবি দেখল

দরজা খুলেই ছবি দেখল, আসিফ সাহেব আর তিনজন কঠোর চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আসিফ ছবির দিকে একটা আঙুলের ইশারা করে বললেন, চলো।

ছবি একটুও ঘাবড়াল না। এসব দেখার অভ্যেস আছে তার।

সে সিঁড়ির দিকটা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকগুলো আড়াল করে আছে বলে কিছু দেখতে পেল না।

ছবি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

আসিফ বললেন, আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই সময়টুকু তুমি কথা বলে নষ্ট করতে চাও, না তৈরি হয়ে নিতে চাও?

আমার অন্য কোথাও যাবার হুকুম নেই।

আমার হুকুম, তোমাকে যেতে হবে।

আসিফের সত্যিকারের জোর কতখানি ছবি তাই দেখে নিতে চায়। সেজন্য একটু সময় দরকার। ভরত গুপ্তর সতর্কতা ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে তার মধ্যে আসিফ এসে এ-রকমভাবে কথা বলে কী করে? ভরত গুপ্ত প্রত্যাঘাত করতে কতটা সময় নেবেন?

ছবি বলল, আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে।

আসিফ ঝকঝকে দাঁতে হাসলেন। এসব পুরোনো কায়দা মেয়েটা তার ওপর চালাবার চেষ্টা করছে। তিনি বললেন, আর চার মিনিট।

আসিফের সাম্রাজ্য আত্মারাম বা ভরত গুপ্তর থেকে কিছু কম নয়। কিন্তু তিনি ওদের মতন শুধু লোক মারফত সব কাজ চালান না। দুঃসাহসী বলে তাঁর নাম আছে। পুরোনো আমলের রাজাবাদশার মতন তিনি অনেক সময়ই বাহিনীর সম্মুখভাগে থাকেন। তিনি ছবির রং-করা মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

আমাকে কোথায় যেতে হবে?

তোমার শাদি হবে।

জনাব, এই বাঁদীর তো আগেই শাদি হয়ে গেছে।

ক-বার? নিশ্চয়ই অনেকবার? আর একবার হতে দোষ কি?

ছবি বুঝল আর তর্ক করে লাভ নেই।

সে জিজ্ঞেস করল, সঙ্গে কিছু নিতে হবে?

তুমি এখানে আর কোনোদিন ফিরে আসতে নাও পার। সেই বুঝে নাও।

ছবি দরজার কাছ থেকে সরে ঘরের মধ্যে এল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনও ঢুকে এল ভেতরে।

ছবির মনের মধ্যে এখন সাংঘাতিক দ্বিধা। সে আর এখানে ফিরে আসবে না—সুতরাং তার সমস্ত দামি জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু নিয়ে যাবে কাদের সঙ্গে? ওই গুণ্ডারা যেকোনো মুহূর্তে তার সব কিছু কেড়ে নিতে পারে। এদের চোখের সামনেই সব কিছু বার করতে হবে। তার চেয়ে না নিয়ে যাওয়া ভালো। কিন্তু ফেলে রেখে যাবেই-বা কার জন্য?

শেষপর্যন্ত, মেয়েলি দুর্বলতায় সে আলমারির লকার খুলে গয়নাগুলো সব বার করে নিল। এক-শো টাকার নোটগুলো একটা ছোট্ট থলিতে ভরে বেঁধে রাখল কোমরে। শাড়ির স্তূপ

ও মূল্যবান বহু পোশাক পড়ে রইল। ছবির একটু একটু কান্না পায়, তবু সে সংযত হয়ে বলল, চলুন।

আসিফ ঘড়ি দেখে বললেন, আরও এক মিনিট সময় আছে। আর কিছু নেবার নেই!

না।

আসিফ তার সঙ্গীদের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা খুব নিপুণ হাতে অত্যন্ত দ্রুত ঘরের সব আলমারি ও ড্রয়ার খুলে পরীক্ষা করে দেখল। তাদের আগ্রহ জন্মাবার মতন কিছু নেই, শুধু স্কচের দু-টি বোতল ছাড়া। আসিফ তাদের সম্মতি দিলেন সে দু-টি নেবার জন্য। একটা বোতল তক্ষুনি খোলা হল এবং চারজনে চারটি বড়ো চুমুক লাগিয়ে দিল, নির্জলা।

আসিফ ছবির বাহু ধরে বললেন, চলো এবার।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটিয়েই নামালো ছবিকে। ছবি একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য হল, বাড়ির ভেতরে শুধু নয়, বাড়ির বাইরেও ভরত গুপ্তর একজনও প্রহরী নেই। এ-রকম তো কখনো হয় না। তাঁর দাসী-পরিচারিকাদের না হয় একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছে, সে তো বোঝাই গেল, কিন্তু গেটের দারোয়ানরাই বা কোথায়? এ বাড়িতে যখন যা হয় ভরত গুপ্ত ঠিক খবর পেয়ে যান, আজ সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে?

একটা শিরশিরে ভয়ের স্রোত বয়ে গেল ছবির শরীর দিয়ে। তাহলে ভরত গুপ্ত কি ইচ্ছে করেই তাকে তুলে দিচ্ছেন আসিফের হাতে? পাগলা কুকুরের সামনে যেরকম একখন্ড মাংস ছুঁড়ে দেওয়া হয়?

ছবি আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন বাড়ির সামনে দাঁড় করানো একটা পুলিশভ্যানে তাকে তোলা হল। ভ্যানটির মধ্যে একজন সাব ইস্টপেক্টর ও দু-জন কনস্টেবল বসে আছে। এসব কী ব্যাপার হচ্ছে?

ছবি সেই গাড়িতে উঠে বসে আবার জিজ্ঞেস করল, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। আসিফ সাহেব সিগারেট ধরিয়ে খুব আরামের সঙ্গে ধোঁয়া ছাড়লেন।

একটুবাদেই যখন পুলিশের লোক তিনটিও স্কচের বোতল থেকে চুমুক দিতে লাগল, তখন ছবি বুঝতে পারল, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। পুলিশের লোকও ডিউটির সময় মদ খেতে পারে কিন্তু কনস্টেবল ও সাব ইনস্পেকটর একই বোতল থেকে চুমুক দেবে না। কিংবা, কে জানে।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। রাস্তাঘাট নিঝুম। ছবিকে বসানো হয়েছে সামনের সিটে, পাশেই আসিফ।

ছবি আসিফের গা ঘেঁষে বসল এবং তার স্তনের স্পর্শ লাগল আসিফের গায়ে।

আসিফ মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল শুধু, কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

ছবি ফিসফিস করে বলল, আমি একটা সিগারেট খাব।

আসিফ কঠোরভাবে বলল, এখন না।

ছবি তবু আসিফের দিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে আদুরে গলায় বলল, আমার শীত করছে।

আসিফ এবারও কোনো কথা বললেন না। ছবি জানে তার একমাত্র সম্পদ তার নিজের শরীর। সেই শরীরটা সে সম্পূর্ণ লেপ্টে দিল আসিফের গায়ের সঙ্গে। এ-রকম শরীরের স্পর্শে মুনিঋষিরও তপস্যা ভঙ্গ হয়, কিন্তু আসিফের কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তিনি স্থিরভাবে বসে রইলেন।

গাড়িটা হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে খুব দ্রুতগতিতে চলে এল বালির দিকে। একটা বিরাট বাগান বাড়ির সামনে থামল। এবারেও আসিফ ছবির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অত্যন্ত জোরে ছুটে গেলেন বাড়িটার মধ্যে।

মস্ত বড়ো দরদালানের পর অনেকগুলো ঘর, সব কটাই অন্ধকার। আলো জ্বলছে শুধু তিনতলায়, সেখানে অনেক লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলেও আসিফ ছবিকে যে ঘরে নিয়ে এলেন, সেটা একেবারে ফাঁকা।

একটা পুরোনো আমলের আরাম কেদারার ওপর ছবিকে ছুড়ে দিয়ে আসিফ বললেন, এখানে চুপ করে বসে থাকো।

এ-রকম টানা হ্যাঁচড়া করার জন্য ছবির একেবারে আঁতে ঘা লেগেছে। সে জানে, সে রূপসী, অধিকাংশ পুরুষই তার সামনে এসে কাদার তাল হয়ে যায়। কিন্তু এরা তার রূপের কোনো মূল্যই দিচ্ছে না।

ছবি সোজা হয়ে বসে বলল, আসিফ সাহেব, আপনি যদি ভেবে থাকেন, আমাকে ধরে এনে ভরত গুপ্তকে জব্দ করবেন, তাহলে আপনি খুব ভুল করেছেন। মেয়েছেলের কোনো মূল্যই নেই ভরত গুপ্তর কাছে। আমার মতন দশটা মেয়েছেলেকে তিনি যখন-তখন কিনে আনতে পারেন। সবাই ওঁর কাছে সমান।

আসিফ বললেন, তুমি যে বাথরুম যাবে বলেছিলে? যাও, ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম আছে।

আপনি আমাকে নিয়ে কী করবেন, আমি জানতে চাই।

আজ রাত্তিরে তোমার শাদি দেব।

ছবি একটা ঘৃণার মুখভঙ্গি করল।

আসিফ সাহেব উর্দুতে কী যেন বললেন। একটু বাদেই দু-জন লোক ধরাধরি করে নিয়ে এল শোভনকুমারকে। সে তখন চূড়চূড় মাতাল। ছবিকে দেখেই সে জড়িয়ে ধরবার জন্য ছুটে আসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এবার ছবির কাছে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এল। এই মূখ শোভনকুমারটা আসিফের সঙ্গে এসে হাত মিলিয়েছে এবং আসিফই একে টেনে এনেছে ভরত গুপ্তকে জব্দ করার জন্য। এইবারই প্রথম ছবি সত্যিকারের ভয় পেল। ভরত গুপ্তকে সে জানে, এদের কাছে তিনি কিছুতেই হেরে যাবার মানুষ নন। ভরত গুপ্ত যে কোনদিক দিয়ে কখন আঘাত করবেন, এরা তা টেরও পাবে না।

ছবি শোভনকুমারকে তুলে এনে চেয়ারে বসালো। তারপর দুই গালে চড় মেরে বলল, বেকুব, তোর মরণ সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে।

শোভনকুমার লাল রঙের চোখ মেলে তাকাল। তারপর বলল ছবি, তুই বলেছিলি না, আমি চাচাজিকে খুন করলে তুই খুশি হবি। দেখ, এবার ওই বুড়ো শেয়ালটাকে আমি শেষ করে দেব।

ছবি বলল, তোর মুরোদ আমার জানা আছে। এর মধ্যে আমাকে টানছিস কেন?

এরপর সব বিজনেস আমার হবে। তুই আমার পাশে থাকবি। তোকে আমার রানি করব।

এই বাক্যটির মধ্যে এমন কী হাস্যরস আছে কে জানে, তবু আসিফ হোহো করে হেসে উঠলেন। রীতিমতন উপভোগের হাসি। তারপর ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পা দুটো ছড়িয়ে হাঁকলেন, দুনিয়া, দুনিয়া!

একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোর হাতে একটা ট্রেতে হুইস্কির বোতল, গেলাস, সোডা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সেটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে সে হাঁটু গেড়ে বসে আসিফের পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

কিশোরটি অত্যন্ত রূপবান, নারীর মতো লাবণ্যমাখা মুখ, টানা টানা চোখ। সে পরে আছে সিল্কের চুস্ত আর পাঞ্জাবি। তার দিকে একবার তাকালে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।

আসিফের পা থেকে জুতো-মোজা খুলে সে উঠে দাঁড়াল। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছবির দিকে। সেই দৃষ্টিতে ঈর্ষা মেশানো।

আসিফ আরাম করে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে তারপর ছেলেটির কোমর জড়িয়ে কাছে টেনে আনলেন। আদর করে বললেন, কেয়া রে দুনিয়া, তুমহারা হালচাল বাতাও!

ছবি এখন বুঝতে পারল, আসিফ সাহেবের কেন মেয়েদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই। তার ঘৃণা আরও বেড়ে গেল। সে চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল, এখান থেকে বাঁচবার কোনো উপায় আছে কিনা।

শোভনকুমার জড়িত গলায় ডাকল, ছবি, এদিকে আয়।

আসিফ বললেন, রিল্যাক্স অ্যাণ্ড হাভ ফান।

শোভনকুমার হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছবিকে নিয়ে এল কোলের ওপরে। তারপর তার শরীর চটকাতে লাগল। ছবি কোনো বাধা দিল না। হাত বাড়িয়ে সে টেবিল থেকে একটা গেলাসে হুইস্কি ভরে নিয়ে এল। সেটা নিজের ঠোঁটের সামনে তুলতেই শোভনকুমার বলল, আমায় দে! আমায় দে!

ছবি এইটাই চাইছিল। সে খুব আদর করে শোভনকুমারের মুখের সামনে গেলাসটা দিয়ে বলল, তোমার জন্যই তো আনছিলাম।

শোভনকুমার এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করার পর ছবি জিজ্ঞেস করল, আর একটু?

সে চায় শোভনকুমারকে অবিলম্বে অজ্ঞান করে ফেলতে।

শোভনকুমার বলল দে, আরও দে! চাচাজির কাছ থেকে তোকে আমরা ছিনিয়ে নিয়ে এলাম, চাচাজি কিছু করতে পারল? এবার ওকে আমরা শেষ করে দেব।

আসিফ বললেন, কলকাতাটা আমার এরিয়া নয়, কিন্তু আমি ইচ্ছে করলে এখানেও যে অনেক কিছু করতে পারি সেটা ভরত গুপ্তকে বুঝিয়ে দিতে চাই।

ছবি কোনো কথা বলল না। সে স্পষ্ট জেনে গেছে এখন যেকোনো একটা গভীর মতলবে ভরত গুপ্ত ইচ্ছে করেই ছবিকে চলে যেতে দিয়েছেন। নইলে, ভরত গুপ্তর কোনো জিনিস, এত সহজে কেউ নিতে পারে না।

আসিফ বললেন, শোভনজি, মন দিয়ে আমার কথা শুনুন ভরত গুপ্তকে খতম করার ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। তাতে অনেক ঝামেলা। আমি কী চাই, বলছি। কলকাতার ডক এরিয়ায় পুরো স্মাগলিং অপারেশন এতদিন আমরা কন্ট্রোল করেছি। মুম্বাই আমার সেন্টার হলেও সব পোর্টে একটা চেন না থাকলে কাজের অসুবিধে হয়। কলকাতার চেন সেইজন্য আমরা ভাঙতে পারি না। ভরত গুপ্ত এখন কলকাতা পোর্ট থেকে আমাদের হঠাতে চাইছে। এটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না—এতে যত টাকা খরচ হয় হোক। এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনার পিতাজির যেসব কম্পানিগুলো উনি দখল করে আছেন, সেগুলো ছিনিয়ে আনার জন্য যা যা ব্যবস্থার দরকার হয় আমি করব।

শোভনকুমার চেঁচিয়ে উঠল, আমার হাতে বহুৎ ডকুমেন্ট আছে। আমি এবার শেষ করে দেব ওকে।

ঠিক আছে, এখুনি ভরত গুপ্তকে টেলিফোন করুন।

ছবি বলল, কোনো লাভ নেই। রাত্তিরে ভরত গুপ্ত কোনোদিন টেলিফোন ধরেন না।

ঠিক আছে, কাল ঠিক ছ-টার সময়–

উনি আটটার আগে কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

আসিফ সাহেব কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, আজব চিড়িয়া! এইরকম লোক কলকাতা কন্ট্রোল করছে, মুম্বাইতে শুনলে সবাই হাসবে! যাই হোক, কালকের মধ্যেই আমাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমি পরশুদিন চলে যাব।

শোভনকুমার ছবির কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, এবার তুই আমাকে শাদি করবি তো?

ছবির উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আসিফ আগেই বললেন, করবে, করবে, নিশ্চয়ই করবে–আপনার মতন এমন খুবসুরত আদমি ও আর কোথায় পাবে?

ছবি মুচকি মুচকি হেসে হাতের হুইস্কির গেলাসটা শোভনকুমারের দিকে নিয়ে গিয়ে বলল, খাও! রাত তিনটে পর্যন্ত এই সব চলল। তারপর ছবি আর শোভনকুমারকে ওই ঘরে রেখে দলবল সমেত আসিফ চলে গেল অন্য ঘরে। ছবি দরজা বন্ধ করে দিল।

শোভনকুমারের তখনও পুরোপুরি জ্ঞান চলে যায়নি। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, কথা জড়িয়ে গেছে তবু ছবিকে টানাটানি করার চেষ্টা করছে।

ছবি বলল, হা রে, উল্লুক, তোর মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

শোভনকুমার শুধু মরণ কথাটা শুনল। বলল, হাঁ, এবার চাচাজি মরবে। আসিফ সাহেব শের কা বাচ্চা, দেখলি তো! তুই কিন্তু ওর কাছে যাবি না। তুই শুধু আমার কাছে থাকবি। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, শাড়িটা খোল না–

ছবির চোখ দুটো জ্বলছে তখন বাঘিনীর মতন। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা সেটা দিয়ে ছ্যাঁকা দিল শোভনকুমারের বাহুতে। শোভনকুমার আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল শুধু একবার, প্রতিরোধ করতে পারল না। ছবি সিগারেটটা ঠেসে ধরে রইল।

তারপর শোভনকুমারেরই পকেট থেকে রুমালটা বের করে গোল্লা পাকিয়ে সেটা পুরে দিল ওর মুখের মধ্যে। শোভনকুমার তখনও হাসবার চেষ্টা করছে। ছবি ওর ঘাড়টা নুইয়ে দুম করে মাথাটা ঠুকে দিল মাটিতে।

একবার দিয়েই ক্ষ্যান্ত হল না, দুম দুম করে অনেকবার ঠুকতে লাগল। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল শোভনকুমারের, একটু বাদেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

একটুক্ষণ বসে হাঁপাতে লাগল ছবি। তারপর উঠে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে ভালো করে হাত দিয়ে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল। আবার ঘরে এসে ঝুঁকে দেখল, শোভনকুমারের জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ আছে কিনা। সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে, গয়নার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ির কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। ছবি একটুও চমকাল না। সে জানতই। লোকটি কোনো কথা বলার আগেই ছবি দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। অত্যন্ত নরম, ভীরু, কম্পিত গলায় বলল, আমার ভয় করছে, আমার ভীষণ ভয় করছে, আমি ওই লোকটার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারছি না।

তারপর সে রক্ষীটিকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে প্রগাঢ় চুম্বন করল। লোকটির যে টুকু দ্বিধা ছিল, ছবি নিজেই কাটিয়ে দিল তা। সে পুরুষটির হাত তুলে এনে নিজের বুকের ওপর রাখল। মিনতিমাখা গলায় বলল, আমাকে তোমরা মুম্বাই নিয়ে যাবে? আমাকে ওই লোকটার হাতে ছেড়ে দিও না! ও একেবারে বাঙালি ভেড়ুয়াদের মতন হয়ে গেছে।

দু-জনে নেমে এল দোতলার একটা অন্ধকার ঘরে।

ছবি লোকটিকে এত ক্লান্ত করে দিল যে কিছুক্ষণ পরে তার ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ছবি আদর করে তার মাথায় হাত দিয়ে ঘুম পাড়ালো। তার জামা প্যান্টগুলো ছুড়ে ফেলে দিল জানলা দিয়ে। লোকটির নাক ডাকার শব্দ হতেই ছবি সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

তার গতিভঙ্গি এখন বেশ স্বচ্ছন্দ। সে একটি ব্যাপার খুব ভালোভাবেই জানে, অচেনা লোক কোনো রূপসী মেয়েকে সহজে খুন করে না। রূপসী মেয়েদের প্রধান বিপদ চেনা লোকেদের কাছ থেকে।

ছবি যখন এসে রাস্তায় দাঁড়াল, তখন সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। একজন ঘুমন্ত রিকশাওয়ালাকে জাগিয়ে সে অনুনয় করে বলল, আমাকে একটু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবে? আমার বড়ো বিপদ।

হাওড়া স্টেশনের কাছে এসে রিকশা ধরার আগে ছবি দু-এক মিনিট দ্বিধা করল। অনায়াসেই এখন সে ট্রেনে চেপে অনেক দূরে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? তার নিয়তিই হচ্ছে একজনের হাত ছাড়িয়ে আরেক জনের হাতে পড়া। আসিফ যদি বালক প্রেমিক না হত তাহলে সে আসিফের সঙ্গে নিশ্চিত মুম্বাই চলে যেত। আসিফের ওপরই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা হচ্ছে তার। এখন পর্যন্ত ভরত গুপ্তই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। বাঘ সিংহের সাহচর্যে থাকা তার অভ্যেস, সে তো আর শেয়াল-কুকুরের সঙ্গে ঘর করতে পারবে না। সে এখানেই থাকবে, ভরত গুপ্তর মৃত্যু দেখে তবে যাবে।

ছবি নিজের বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, দারোয়ান, পরিচারিকারা যে যার নিজের জায়গায় ঠিক আছে। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। গিজারে জল গরম করতে দিয়ে ছবি বাথরুমে স্নান করতে ঢুকল।

ঠিক আটটার সময় সে টেলিফোন করল ভরত গুপ্তর বাড়িতে। ভরত গুপ্তকে সরাসরি টেলিফোনে পাওয়া যায় না কখনো। অনেক হাত ঘুরে নিজে যখন লাইনে এলেন, তখন তিনি ভালোভাবেই জানেন টেলিফোন এসেছে কার কাছ থেকে।

তবু ভরত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, কে?

আমি ছবি।

ও, ছবি? তা হঠাৎ এই সকালবেলাতেই যে? শরীর-টরীর ভালো আছে তো?

আপনার মেহেরবানীতে আমি এখন ভালো আছি।

রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

কাল রাত্রে এক ফোঁটাও ঘুমোইনি।

ও, তাই নাকি? বাঃ। তাহলে তো তোমাকে একটা কিছু পুরস্কার দিতে হবে। আমি তো তোমাকে খরচের খাতাতেই লিখে রেখেছিলাম।

আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না?

তুমি কি অবিশ্বাসের কিছু কাজ করেছ?

না।

তা হলে? যাই হোক, তুমি বালির বাগানবাড়ি থেকে এত সকালেই ফিরলে কী করে?

অ্যাঁ? আপনি তা-ও জানেন?

আমি অনেক কিছুই জানতে পারি।

তবু আপনি, আপনি আমাকে ওদের হাতে...

এবার বলো, কাল রাত্রে কী কী হল।

৭. একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর দিন

একটা পরিচ্ছন্ন সুন্দর দিন। দুপুর বেলা ঝকঝক করছে রোদ, অথচ তেমন গরম নেই। আকাশ পরিষ্কার। ছুটির দিন নয়, কাজের দিন। কিন্তু কাজের দিন মানেই এই নয় যে, দুপুর বেলা সমস্ত সক্ষম লোক অফিসে কিংবা কলকারখানায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে। পথে পথে অজস্র ভিড়, অসংখ্য গাড়ি, ট্রাম বাসে ঠাসাঠাসি। ম্যাটিনি শো হাউসফুল।

বেবী ফুডের জন্য বিরাট লম্বা লাইন। ময়দানে এই সময়েই দেখা যাবে তরুণ-তরুণীরা গাছের ছায়ায় বিখ্যাত ভঙ্গিতে বসে আছে। কিছু লোক এমনিই হাত-পা ছড়িয়ে মাঠে শুয়ে থাকে, এরা কোথা থেকে এসেছে কিংবা কোথায় যাবে, তা কিছুই বোঝা যায় না।

আবার, বহুলোক মিছিলে বেরিয়েছে, নানারকম সরকার-বিরোধী শ্লোগান এবং ফেস্টুন। এরই পাশ দিয়ে অস্বচ্ছ কাচে ঘেরা গাড়িতে কখনো ভরত গুপ্ত, কখনো আত্মারাম কিংবা আসিফ সাহেব চলে যান। এঁদের কেউ চেনে না, কোনো পত্রপত্রিকায় এঁদের ছবিও ছাপা হয় না। একজন ক্যামেরাম্যান আসিফ সাহেবের গাড়ির ঠিক পাশে দাঁড়িয়েই ছবি তুলছে ওই মিছিলের। সব মিছিলের দৃশ্য প্রায় একইরকম, তবু প্রত্যেকবার নতুন করে ছবি তুলতে হয়।

আর যাঁদের ছবি নিয়মিত ছাপা হয়, লোকে নাম শুনলেই চিনতে পারে, সেই সব মন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিংসে এখন দারুণ ব্যস্ত। বহু রকমের কৃপাপ্রার্থী, সাহায্যপ্রার্থী, ঘন ঘন টেলিফোন, পি এ এবং সি এ এবং অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, আণ্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি–এর পরেও আছে মহান দেশের সমস্যা। গাদাগাদা ফাইল এবং মৌখিক উমেদারি। এঁদের প্রত্যেককেই বিকেলের পর কোনো-না-কোনো জনসভায় কিংবা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হবে। পার্টি মিটিং। অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা পুজোর ফাংশান অথবা উন্নয়ন সংক্রান্ত সেমিনার অথবা শ্রাদ্ধবাসর। একটুও নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

এর মধ্যে রেশনের দোকানের সামনে হইচই চলতে থাকে। বিভিন্ন পার্টি অফিসে একদল অপর দলের মুন্ডপাত করে। বিরাট হোটেলের সামনে কাঙালিরা সাহেব দেখলেই হেঁকে ধরে। সেই হোটেলেরই কোনো ঘরে দু-জন লোক একটা সুটকেশ ভরতি বিস্কুট আসিফ সাহেবের হাতে তুলে দেয়। বিস্কুটগুলি সবই সোনার তৈরি।

এই সময়েই অন্য কোথাও ছেলেরা কবিতা লেখে, মেয়েরা ঘন ঘন লেটার বক্সের দিকে নজর রাখে, রেডিয়োতে গান বাজে, বাসের পাঁচ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি বিষয়ে লোকেরা তর্ক করে, হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে একজন দৌড়ে যায় ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে। পঞ্চান্ন হাজার শিশুর জন্ম হয়ে গেল।

অরণ্যে হিংস্র পশু থাকে, তাই মানুষ অরণ্যে প্রবেশ করার সময়েই সতর্ক হয়ে যায় কিংবা অস্ত্র সঙ্গে নেয়। এই শহরের মতন মানুষের অরণ্যে হিংস্র প্রাণীগুলিকে চেনা যায় না– মানুষের পাশে পাশেই মানুষের মতন চেহারায় বাঘ, কুমির, সাপেরা ঘুরে বেড়ায়।

বালির সেই বাগানবাড়ি থেকে শোভনকুমারকে সকাল বেলাই সরিয়ে আনা হয়েছিল। তার আঘাত গুরুতর নয়, তবে রক্তের মধ্যে মাদকের প্রভাব কাটতেই অনেক সময় লাগল। আসিফের নিযুক্ত করা দু-জন লোক তাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছে রয়েড স্ট্রিটের একটি বাড়িতে। একজন নার্স সেবা করছে। জ্ঞান ফিরলেও শোভনকুমারের কথাবার্তা অসংলগ্ন। ছবির নাম করে সে কাঁদছে মাঝে মাঝে। ছবিকে তার চাই।

অন্য কোথাও একজন ব্যারিস্টারকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হয়েছে। শোভনকুমার একটু সমর্থ হলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে সেই ব্যারিস্টারের কাছে। ভরত গুপ্ত সম্পর্কে যাবতীয় গোপন তথ্য সে জানাবে। তারপর সেই ব্যারিস্টার পরীক্ষা করে দেখবেন, ভরত গুপ্তকে কোন কোন দিক থেকে চাপ দেওয়া যায়। আসিফ সাহেবের এই এক প্রসিদ্ধ কৌশল শত্রুপক্ষ খুব প্রবল হলে সেই শত্রুর পরিবার থেকে একজন কুলাঙ্গার খুঁজে বার করে নিজের দলে আনা। এতে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

মাথার ক্ষতস্থানে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো হয়েছে, শোভনকুমার সবেমাত্র এক কাপ গরম দুধে চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিল, বাইরে পুলিশের গাড়ি।

আসিফের সহকারী দু-জন কটমট করে তাকাল শোভনকুমারের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করল, পুলিশ এসেছে কেন?

শোভনকুমার বলল, তোমরা কে? তোমরা কি খুনি?

ওদের একজন বলল, পুলিশ কাকে খুঁজতে এসেছে জানি না। যদি আমাদের ধরে, তোমাকে আমরা চিনি না। যদি তোমাকে ধরে, আমাদের তুমি চেনো না। আসিফ সাহেবের নাম যদি একবারও উচ্চারণ করো, তাহলে তোমার জিভ ছিড়ে নেওয়া হবে।

লোক দু-টি ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠে গেল ওপরের দিকে। বাড়িটা পাঁচতলা, অসংখ্য ভাড়াটে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, অবাঙালি মুসলমান, পাঞ্জাবি প্রভৃতি নানা জাতের সংমিশ্রণ। ওরা দু-জনে আলাদা হয়ে ঢুকে গেল চারতলা ও পাঁচতলার দু-টি ফ্ল্যাটে।

নার্সটিও চলে গেছে ঘর থেকে। একা ঘরের মধ্যে বসে শোভনকুমার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে সত্যিকারের একটি পুলিশের গাড়ি। সত্যিকারের তিনজন ইন্সপেক্টর সোজা উঠে এল দোতালায়।

একজন ইন্সপেক্টর শোভনকুমারকে বলল, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

তারপর সিঁড়িতে দাঁড়াননা কৌতূহলী জনতার মধ্য থেকে দু-তিনজনকে ডেকে বলল, আমরা একে, ডি আই আর এ অ্যারেস্ট করছি। এর ঘর থেকে আমরা যেসব জিনিসপত্র উদ্ধার করব, আপনারা তার সাক্ষী থাকুন।

শোভনকুমার হতভম্ভ হয়ে বলল, আমি কী করেছি? আমার নামে কী চার্জ আছে?

পুলিশ অফিসারটি মিষ্টি করে জবাব দিল, আপনার নামে কালোবাজারির অভিযোগ আছে। আপনি যে গোডাউনের ঠিকানা দিয়েছেন, তা সবই ভুয়ো।

এই অভিযোগের সমর্থনে বিস্তর কাগজপত্র বেরোলো সেই ঘর থেকে।

জনতার মধ্যে থেকে একজন বলল, কিন্তু একে তো আমরা কখনো এই বাড়িতে আগে দেখিনি! এটা তো পেরেরা সাহেবের ঘর।

পেরেরা সাহেবকেও আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না। ইনিই অন্যের নামে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন।

সব কাগজপত্রে শোভনকুমারের সই। শোভনকুমার দেখে নিজেই চিনতে পারছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এ ব্যাপারে সে বিন্দুবিসর্গও জানত না। ভরত গুপ্ত এই ছোট্ট ব্যাবসাটা ইচ্ছে করেই শোভনকুমারের নামে করিয়ে রেখেছিলেন, এইরকম জরুরি প্রয়োজনের কারণে। রাঁচিতে তাঁর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বংশীলাল মাতাল অবস্থায় শোভনকুমারকে দিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়েছে নানা সময়ে।

বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে শোভনকুমারকে বন্দি করা হল। দড়ি বাঁধা হল তার কোমরে ও হাতে। পুলিশের গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। বিরাট জনতার ভিড়ের মাঝখানে ওইটুকু রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। দু-জন প্রেস ফোটোগ্রাফার কোথা থেকে খবর পেয়ে হাজির হয়ে ছবি তুলতে লাগল দৌড়োদৌড়ি করে। কালো বাজারির কোমরে দড়ি—এই ক্যাপশান দিয়ে আগামী কালের কাগজে এই ছবি ছাপা হবে।

শোভনকুমার ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে। তার চাচাজি তাকে এইভাবে জব্দ করল? ঠিক আছে, জেল থেকে বেরিয়ে সে নিজের হাতে চাচাজিকে খুন করবে। তারপর যা হয় তা-ই হবে।

কৌতূহলী জনতাকে ছাড়িয়ে গাড়িটা অন্য রাস্তায় পড়তেই সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। এখানকার কেউ আর গাড়িটার দিকে তাকিয়েও দেখে না। এখানকার লোক ব্যস্ত আছে অন্য কাজে। একটা ষাঁড় হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ছোটাছুটি করছে রাস্তার মাঝখানে। লোকজন ছুটে ছুটে পালাচ্ছে চারদিকে, খানিকটা ভয়ে, খানিকটা কৌতুকে।

শোভনকুমারের চোখে জল এসে গেল। সে আসলে অত্যন্ত দুর্বল ও ভীরু লোক। খুন-টুন তার ধাতে নেই। অজগরের দিকে আকৃষ্ট ছোটো পশুর মতন সে তার চাচাজি সম্পর্কে ঘোরতর টান অনুভব করে। চোখের জলের মধ্যে সে হঠাৎ বুঝতে পারল, তার চাচাজি কত দয়ালু। চাচাজি তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আসিফের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তাকে ক্রমশই বেশি বিপদে পড়তে হত। দুই পক্ষের যুদ্ধের মাঝখানে সে হয়ে পড়ত অসহায় খুঁটি। সেইখান থেকে তাকে সরিয়ে আনার এর থেকে ভালো উপায় আর নেই। কয়েকদিন জেলে থাকতে হবে বটে কিন্তু একদিন-না-একদিন তাকে জামিনে খালাস দিতেই হবে। ভরত গুপ্তর নিযুক্ত সবচেয়ে মূল্যবান উকিল লড়বে তার হয়ে। তারপর যদি শাস্তিও হয়, বড়ো জোর দু-মাসের কারাবাস ও কয়েক হাজার টাকা ফাইন। ফাইনের টাকাটা তো নস্যি। তার হয়ে অন্য লোক জেল খেটে আসবে—তাকেও দু-আড়াই হাজার টাকা দিলেই হবে। শোভনকুমার চোখের জল মুছে ফেলল। আলিপুরের নিজের বাড়িতে আত্মারাম একটা টাকার স্তূপের সামনে বসে আছেন। সব এক-শো টাকার নোটের বাণ্ডিল। আত্মারামের চেহারাটি বিরাট, দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থ বেশি। তাঁর ঘুম না হওয়ার অসুখ আছে বলে মুখখানা সবসময় চোপসানো মনে হয়।

আত্মারাম একটু আগে খেলার মাঠ থেকে ফিরেছেন। খেলা ভন্ডুল করার ব্যাপারে ভরত গুপ্তর পরিকল্পনাটি এমনই নিখুঁত যে সত্যিই তারিফ করতে হয়। কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। যে রেফারি ছিল, তার সম্পর্কে কেউ কোনোদিন বদনাম দিতে পারেনি, সেই লোক আজ গাধার মতন পর পর ভুল করতে লাগল কী করে? দর্শকদের মধ্যে ভরত গুপ্তর সাজানো কিছু লোক থাকলেও অনেক খাঁটি দর্শক সেই সঙ্গে নেমে এসেছে মাঠে।

আর সেই নাকে ঘুষি মারার ব্যাপারটা? সকলের চোখের সামনে পরিষ্কার ছবির মতন–।

আত্মারাম দু-জন অনুচরকে ডেকে টাকাগুলো দেখিয়ে বললেন, এর থেকে দশ লাখ গুনে আলাদা করো।

লোক দু-টি হাঁটু গেড়ে বসে টাকা গুনতে লাগল। আত্মারাম তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন সে-দিকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে তাঁর কপালে ঘাম জমছে। রুমাল নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে ভাবলেন, এত সহজে খেলা বন্ধ করা যায়, এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। তিনি ভেবেই দেখেননি যে এই বিশেষ দিনে খেলাটা বন্ধ করার তাৎপর্য কতখানি। ভরত গুপ্ত এবার খুব জোর টেক্কা দিয়েছে। লোকটা প্রায়ই আজে বাজে বাজি ফেলে ইচ্ছে করে হারে, তার জন্যই প্রতিপক্ষকে বেশি চিন্তা করতে দেয় না। যাক, এরপর থেকে সাবধান হতে হবে।

লোক দু-টি টাকা গোনা শেষ করে বসে আছে চুপ করে। আত্মারাম বললেন, ঠিক হুয়া তো? ফির সে গুনো।

একজন বলল, দু-জনে আলাদা করে গুনেছি। বেশি হয়নি।

আত্মারাম ধমক দিয়ে বললেন, বেশি গেলে ক্ষতি নেই। কম না হয়। দেখো আর একবার!

আবার গোনা হল। তারপর সেগুলো ভরা হল একটা বালিশের মধ্যে। বালিশটাতে পরানো হল মখমলের ওয়াড়। আত্মারাম সেটা হাতে নিয়ে ওজন করে বললেন, বাঃ! আমার বাগান থেকে দশটা গোলাপ ফুলও এই বালিশের সঙ্গে পাঠিও।

একজন সহচরের দিকে আঙুল তুলে আত্মারাম বললেন, তুমি এটা পৌঁছে দাও। তুমি বলবে, শুধু তুমি ভরত গুপ্তর হাতেই দেবে। ভরত গুপ্ত অবশ্য নিজের হাতে নেবে না কিছুতেই, ওর অনেকরকম বাতিক আছে। কিন্তু অন্য কেউ নিলেও তুমি দেখবে যাতে

ভরত গুপ্ত সেখানে উপস্থিত থাকেন। তুমি তাঁকে বলবে, আমি বলেছি, এই বালিশ মাথায় দিয়ে আপনার ভালো ঘুম হোক।

আত্মারাম অন্য সহচরটিকে বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও।

বালিশটা নিয়ে প্রথম জন চলে যাবার পর আত্মারাম তাঁকে বললেন, বোসো। কলকাতা শহরে এখন চিনির স্টক কত?

দু-লক্ষ কুইন্টাল।

হুঁ। ডাল কত?

লোকটি যেন যন্ত্র। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দেয়, তিন লক্ষ সাতাশি কুইন্টাল।

হু। চালের খুচরো দর কত যাচ্ছে?

চার টাকা তিরিশ পয়সা কেজি।

কাল থেকে বাজারের সব ডাল কিনে নেবে। আগামী সাতদিনের মধ্যে বাজারে একদানা চিনিও বার করবে না। ডালের দাম প্রতি কেজিতে আট আনা বাড়াবে। যার ইচ্ছে হয় নেবে, যার ইচ্ছে না হয় নেবে না। বড়বাজারে কেউ যদি কম দামে ডাল ছাড়তে চায়, তার কাছে আমার নাম করবে। যদি কথা না শোনে, তাদের নাম জানিয়ে দিও পুলিশের কাছে।

সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঁউরুটির কী করা যায়? কিছু করা যাবে?

যাবে।

বাঃ। সাতদিনে আমাকে টাকাটা তুলে নিতে হবে। তা ছাড়া, গভর্নমেন্টের লোকগুলো ভরত গুপ্তর আঙুলের খেলায় নাচছে, ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। এখন ডবল দাম দিলেও বেবি ফুড ছাড়বে না। ভরত গুপ্ত নাকি আজ তার নিজের ভাইপোকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে?

হ্যাঁ।

আত্মারাম তখন উচ্চকণ্ঠে হা-হা করে হেসে উঠলেন। প্রভু হাসলে ভৃত্যের গম্ভীর থাকা চলে না, তাই অন্য লোকটিও হাসতে শুরু করল।

ঠিক সেই সময়ে ডায়মণ্ড রোড ধরে ছুটে যাচ্ছে দু-টি সুদৃশ্য আমদানি করা গাড়ি। একটা গাড়িতে আত্মারামের ছেলে ব্রীজমোহন আর প্রখ্যাত মিশরীয় ক্যাবারে নর্তকী রিন টিন টিন। উভয়েরই হাতে বিয়ারের গেলাস। ব্রীজমোহনের অন্য হাত তার সঙ্গিনীর উরুর কাছে সদা ব্যস্ত। অন্য গাড়িতে ব্রীজমোহনের ইয়ার বকশির দল।

এমন সময় উলটোদিক থেকে ধেয়ে এল দৈত্যের মতন ট্রাক। ট্রাকটি খালি এবং ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। চওড়া রাস্তা এবং প্রচুর জায়গা থাকা সত্ত্বেও ট্রাকটি অত্যন্ত কৌশলে ব্রীজমোহনের গাড়িটিকে পাস দেবার জন্য হাত দেখিয়েও ধাক্কা লাগালো পাশের দিকে। ব্রীজমোহনের গাড়িটি ছিটকে পড়ল পাশের ধানের খেতে। ট্রাকটি উর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

অন্যরা যখন ব্রীজমোহনের কাছে গেল, তখনও ব্রীজমোহনের এক হাতে ধরা কাচের গেলাস, সেই গেলাসটা অনেকখানি ঢুকে গেছে তার গালের মধ্যে। হাতখানা কনুইয়ের কাছে ভেঙে সাদা হাড় বেরিয়ে এসেছে। রিন টিন টিন আহত হলেও জ্ঞান হারায়নি। সে দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

শোভনকুমারের গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ আসিফ সাহেবের কাছে পৌঁছোল বিকেল চারটের সময়। তিনি বিনা মন্তব্যে খবরটা শুনলেন। একটা ঠাণ্ডা নিষ্ঠুরতার ভাব খেলে গেল তাঁর মুখে। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তিনি দু-তিন মিনিট চিন্তা করলেন।

তারপর দুমুখকে জিজ্ঞেস করলেন, অন্য সব অবস্থা এখন কীরকম?

লোকটি সংক্ষেপে বলল, হট।

আসিফ সাহেব বললেন, আই উইল মেক ইট হটার। আমাকে যে কালই চলে যেতে হচ্ছে।

সিণ্ডিকেট বলছে, আপনার আজই চলে যাওয়া উচিত। ইভনিং ফ্লাইট বুক করে রেখেছি।

আজই? কেন?

রেণ্ডির বাচ্চা শোভনকুমারটা পুলিশের কাছে কী বলবে তার ঠিক নেই।

পুলিশ? ফুঁঃ!

কলকাতায় অপারেশানটা আমাদের পরে এসে ঠিক করতে হবে। লোকাল লোকদের ওপর ঠিক ভরসা করা যাচ্ছে না। খবর পেয়েছি, ডক এরিয়ায় আমাদের সব লোককে পুলিশ আজ ধরার চেষ্টা করবে। আমরা সবাইকে সরে যেতে বলেছি।

ব্লাডি ফুল, তারা সরে গেলেই অন্য লোক এসে ঢুকে পড়বে। ভরত গুপ্ত তো তাই-ই চায়। ঠিক আছে, ফ্লাইট ক-টায়?

দশটায়। জামশেদপুর থেকে।

আর আগে আমি আর একবার বেরুব।

আসিফ সাহেব আত্মারামকে টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করলেন। তিন-চার জায়গায় নম্বর চেয়েও পাওয়া গেল না। আসিফ তখন অসীম বিরক্তির সঙ্গে টেলিফোনটা ছুড়ে ফেললেন টেবিলের ওপর।

অবিলম্বে আসিফ বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। তাঁর নিজের হাতে বিস্কুট ভরতি ছোটো সুটকেসটা। অন্য দু-জন লোকের হাতে আর দু-টি ব্যাগ। কাউন্টারে তাঁর দাম মিটিয়ে দিল সঙ্গীদের মধ্যে একজন।

তিনি বাইরে দাঁড়াতেই একটা গাড়ি চলে এল। সদলবলে গাড়িতে উঠে আসিফ বললেন, খিদিরপুর।

ঝকঝকে বিকেলের আলোর মধ্য দিয়ে গাড়িটা চলতে লাগল কলকাতার রাস্তা দিয়ে। রাস্তায় সেই একইরকম ভিড়। মিছিল, ভিখিরি, প্রেমিক-প্রেমিকা, অধ্যাপক, দালাল, ছাত্র, ব্যবসায়ী, কেরানি, বেকার, কবি, শিল্পী, বেশ্যা, জননেতা, বাঘ, কুমির, সাপ।

আসিফের গাড়িটা সাবলীল গতিতে এগিয়ে, গঙ্গার ধার ঘুরে এসে পড়ল ওয়াটগঞ্জে। একটা বস্তির কাছে থামল। আসিফের সঙ্গী দু-জন নেমে গিয়ে এমন কয়েকজন লোককে ডেকে আনল যাদের কোনোক্রমেই ওই বস্তিতে থাকার কথা নয়। ওয়াটগঞ্জের বস্তি কলকাতার দরিদ্রতম জনবসতির অন্যতম, আবার ওখানেই এমন কিছু লোক থাকে, যারা যেকোনো সময় এক লক্ষ টাকা বার করতে পারে।

আসিফ খুব চাপা উর্দুতে জিজ্ঞেস করলেন, স্ট্রাইক ভেঙেছে?

একজন লোক বলল, না।

বন্দরে ধর্মঘটের সময় সিকিউরিটি ব্যবস্থার অনেক কড়াকড়ি হয়। ভরত গুপ্ত ইউনিয়নগুলির মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে ধর্মঘট লাগিয়ে দিয়েছে, তা আসিফ এখনো বুঝতে পারেননি। এইভাবে ভরত গুপ্ত ইউনিয়নগুলোকে অপ্রত্যক্ষভাবে হাত করে নিয়ে আসিফের চেনটা ভেঙে দিতে চাইছেন! হাতঘড়ির একটা বিরাট কনসাইনমেন্ট জাহাজে আটকা পড়ে আছে। আসিফের লোকজন কিছুতেই তা বার করতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পং সফর শেষ করে না ফিরলে ধর্মঘট আর মিটবে না—এখন এটা রাজনৈতিক স্তরে চলে গেছে।

আসিফ বললেন, আমার হাতে বেশি সময় নেই। তোমরা ধর্মঘট ভাঙতে পারবে? আত্মারামের ওপর আমরা আর ভরসা করতে পারছি না। ওটা একটা গাধা।

লোকেরা বলল, তারা ধর্মঘট ভাঙতে পারবে না।

আসিফ বললেন, তাহলে আজ রাত্রেই একটা বড় রকমের দাঙ্গা লাগিয়ে দাও এখানে। বোমা ছুড়তে পারে এমন যতগুলো ছেলেকে পাও জোগাড় করো। রাজনীতির লোকেদের বেশি মারবে। তাহলেই দেখবে এমনিতেই আরও অনেক ছেলে জুটে যাবে। অন্তত দু তিনজন মন্ত্রীকে যেন এখানে ছুটে আসতে হয়। বিকেল থেকেই শুরু করবে, তাহলে দিল্লিতে ঠিক সময় খবর পৌঁছোবে।

আসিফ সহকারী দু-জনের দিকে ইঙ্গিত করতেই তারা হাতের ব্যাগ খুলল। আসিফ গোছা গোছা টাকা তুলে দিলেন ওদের হাতে। এবং চারটে রিভলবার। তারপর বললেন, কাজ ভালো হলে বোনাস পাবে।

আসিফ আর অপেক্ষা করলেন না। গাড়ি ছেড়ে দিল। একটু দূরে যেতেই মোড়ের কাছে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল হাত দেখিয়ে গাড়িটা থামালো। তারপর সে এগিয়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে।

কনস্টেবলটির কি উদ্দেশ্য ছিল তা জানা গেল না। তার আগেই ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে আসিফের মুখ কুঁচকে গেল। তিনি অনুচরদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন, ফায়ার!

দু-জন সহচরই একসঙ্গে চালাল গুলি। কনস্টেবলটির লম্বা শরীর ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। ছাপরা জেলার রামধারী সিং পাঁচটি সন্তানের জনক এবং বারোটি পোষ্য সমেত এক পরিবারের অধিপতি মৃত্যুর আগে জানল না সে কেন মরছে।

আসিফের গাড়ি বেরিয়ে গেল হুস করে। চাঁদপাল ঘাটের কাছে আসিফ এবং তাঁর সঙ্গীরা নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। একটা স্পিড বোটে চেপে অপরাহ্নের গঙ্গায় সুবিদিত দৃশ্যের

মধ্য দিয়ে চলে এলেন এপারে। হাওড়ায়। সেখানে নির্দিষ্ট জায়গায় আর একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়িতে ওরা ওঠার পর সেটা দুর্দান্ত গতিতে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ছুটল জামসেদপুরের দিকে। সঙ্গে বিস্কুটের সুটকেস থাকলে আসিফ কখনো কলকাতার এয়ার পোর্ট ব্যবহার করেন না।

৮. খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের

খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যাপারে ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে অতি-দ্রুত থামিয়ে দিয়েছেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা। উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে তিনি জিপ গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন। মিসায় গ্রেপ্তার হয়েছে তিন হাজার। তেল, ডাল, চিনি, কেরোসিন, পাঁউরুটি বাজারে ফিরে এসেছে, কিছু বর্ধিত দামে। এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানানোর জন্য ধার্য হয়েছে দেড় সপ্তাহ পরের একটি তারিখ। কলকাতা আপাতত কয়েকদিন শান্ত।

বিকেল বেলা বাড়িতে থাকলে দীপুকে নিজেকেই চা বানিয়ে খেতে হয়। তার ছোড়দি আর জামাইবাবু দু-জনেই চাকরি করেন, ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায় বেশ।

ঠিকে ঝি ক-দিন ধরে আসছে না। সল্টলেকের খালধার থেকে তুলে আনা কী এক রকমের বুনো শাক খেয়ে তাদের বাড়ির সকলের গায়ে নাকি গরল বেরিয়েছে।

দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপু। ঘুম যখন ভাঙল তখন সাড়ে পাঁচটা, একটু একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। ধড়মড় করে উঠে বসল দীপু। দরজা-টরজা সব খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, এদিকে চোরের উপদ্রব খুব বেড়েছে।

একটু চা না খেলে চলে না। রান্নাঘরে এসে দীপু বেশ অসুবিধেয় পড়ল। গ্যাসের উনুন আছে, কিন্তু গ্যাস নেই। খবর দিলেও দশ-বারো দিনের আগে পাওয়া যায় না। কেরোসিনের স্টোভ আছে, কেরোসিন নেই। কোন দোকানে যেন সকালে লাইন দিয়ে দাঁড়ালে কেরোসিন পাওয়া যায়—কিন্তু কে আনবে? জামাইবাবু শৌখিন লোক, উনি জীবনে কখনো বাজারেই ঢোকেননি—লাইনে দাঁড়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। উনি বলে দিয়েছেন, বাড়িতে রান্না না হলে আমি না খেয়ে থাকব, তবু ও সব কাজ আমার দ্বারা হবে না। আর ছোড়দি কিছুতেই দীপুকে এসব কাজে পাঠাবে না কখনো। অপর্ণার বড়ো

আদরের ভাই। তা ছাড়া, দীপু আর ছোড়দির বাড়িতে থাকে বলেই ছোড়দি অত্যন্ত সাবধানী, যাতে দীপু কখনো না মনে করে যে তাকে দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দীপুর নিজে থেকে কিছু করা উচিত, কিন্তু খেয়ালই থাকে না। এইসব সাংসারিক ব্যাপারে তো সে কখনো মাথা ঘামায়নি। দীপু ঠিক করল, কাল সকাল বেলা কারুকে কিছু না বলে সে কেরোসিন এনে ছোড়দিকে চমকে দেবে।

সুইচ টিপে দেখল, আলো জ্বলছে। যাক, আজ লোডশেডিং-এর দিন নয়। একটা ছোটো ইলেকট্রিক হিটারে দীপু এক কেটলি জল বসিয়ে দিল। খালি বাড়িতে থাকলে মনটা কীরকম চঞ্চল হয়ে যায়। শান্তার কথা বারবার মনে পড়ে। এইরকম একটা ফ্ল্যাট তাকেও ভাড়া নিতে হবে। সেখানেও গ্যাস, কেরোসিন, চিনি, চাল এইসব জোগাড় করার সমস্যা থাকবে। যাক, শান্তা খুব কাজের মেয়ে, ও সব ম্যানেজ করতে পারবে। কিন্তু চাকরিই জুটল না এখন পর্যন্ত। দীপু মনে মনে হাসল।

এক কেটলি গরম জলে তিন কাপ চা হল, সবটাই খেয়ে ফেলল দীপু। তারপর জামাকাপড় বদলে বেরুবে। তার শার্টের পকেটে মাত্র এক টাকা বারো আনা আছে। সুটকেসে আর একটাও টাকা নেই। টাকাপয়সা জোগাড় করার একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। একটা কিছু এবার করতেই হবে। সে যাক গে, এখন তো এত কম পয়সা পকেটে নিয়ে বেরুনো যায় না।

ক-দিন ধরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, প্রায়ই দীপুর পকেট মারা যাচ্ছে। তার পকেটে দু-তিন টাকার বেশি থাকে না, তবু পকেট মাররা তার পকেটের দিকেই নজর দেয়। কী বোকা রে বাবা! পর পর দু-দিন এরকমভাবে দীপুর পকেট কাটা গেছে। একদিন তো এমন অবস্থা, শান্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। অথচ দীপুর বাস ভাড়া পর্যন্ত নেই। হেঁটেই যেতে হল তিন মাইল। শান্তা চলে যায় নি, দাঁড়িয়েছিল ঠিক। তারপর শান্তার কাছ থেকে দীপুকে পয়সা চাইতে হল।

ছোড়দির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ঘেঁটে তিনটে টাকা পেয়ে গেল। ছোড়দির ভুলো মন, যেখানে-সেখানে টাকাপয়সা রাখে, এই একটা সুবিধে। সেই স্কুলে পড়ার সময় দীপু ছোড়দির ড্রয়ার থেকে টাকা নেয়, সেই অভ্যেস এখনো যায়নি। এই টাকা তিনটের কথা ছোড়দির মনে না থাকলেই ভালো। ছোড়দি যদি বুঝতে পারে দীপু নিয়েছে, তাহলে ছোড়দি আবার জোর করে তাকে দশ টাকা কুড়ি টাকা দেবার চেষ্টা করবে।

ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগিয়ে দীপু চাবিটা দিতে গেল একতলায়। এই রকমই বন্দোবস্ত। একতলার ফ্ল্যাটের চিন্ময়বাবু আর তাঁর স্ত্রী সেই সময় খুব ঝগড়া করছিলেন। হঠাৎ দীপু এসে পড়ায় তাঁরা অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেলেন। চিন্ময়বাবুর মুখে তখনো রাগ-রাগ ভাব, সেই অবস্থাতেই তিনি দীপুকে বললেন, আসুন-না, ভেতরে একটু বসবেন, চা খেয়ে যান।

দীপুর পেটে তখন তিন কাপ চা। সে হেসে বলল, এখন চা খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। চলি!

চিন্ময়বাবু আর ঊষা বউদির বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর আগে, তবু ওঁরা প্রায়ই ঝগড়া করেন। ছোড়দি আর জামাইবাবুকে এ-রকম ভাবে চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে কখনো দেখেনি দীপু, কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁদের শোবার ঘরে চাপা রাগের কথাবার্তা হয়, দীপু টের পেয়েছে।

দীপু যখন থাকে না, তখনও কি এ-রকম ঝগড়া হয়? বিয়ে করলেই কি স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করতেই হবে? দীপুর একটু ভয় ভয় করে।

বাইরে বেরুবার পরই এক ঝলক টাটকা হাওয়া মুখে এসে লাগায় দীপুর মন ভালো হয়ে গেল। সে সহজেই খুশি হতে জানে। ফুলবাগানের মোড় পর্যন্ত সে হেঁটেই যাবে ঠিক করল।

তার অনুসরণকারী আজ একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। দীপু হাঁটতে শুরু করায় বেশ অসুবিধে হল লোকটির। গাড়িতে আজ তার অন্য দু-জন সঙ্গীও আছে।

ফুলবাগানের মোড় থেকে দীপু একটা টেলিফোন করল শান্তার বাড়িতে। রিসিভারটা তুলে ডায়াল ঘোরাবার আগেই দীপুর মনে হল, শান্তা এখন বাড়িতে থাকবে না। সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেল শান্তাদের বাড়ি, বিভিন্ন ঘর, বারান্দায় চেয়ারগুলো ঠিক কীভাবে ছড়ানো, শান্তার বাড়ির আর সবাই আছে শুধু শান্তা নেই। দীপু মাঝে মাঝে এ-রকম দেখতে পায়।

তবু তিরিশ পয়সা খরচ করে টেলিফোন করতেই হল। শান্তার মা বললেন, শান্তার ফিরতে দেরি হবে, ওদের কলেজের সোশ্যাল ফাংশান আছে!

শান্তাকে না পেয়ে দীপু ঠিক দুঃখিত বোধ করল না, আগে থেকে যা মনে হয়, সেটা মিলে গেলে সে একটু সুখও পায়।

এবার সে কোথায় যাবে? একলা কোনো একজন মানুষ সন্ধ্যে বেলা কোথায় যায়? দীপুর কোনো যাবার জায়গা নেই। তাহলে সে অরূপের এগজিবিশনেই যাবে।

তার বন্ধু অরূপের ছবির একক প্রদর্শনী হচ্ছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। দীপু সেখানে দু-তিন দিন গেছে। তবু ওখানে গেলে সময় কাটবে। বাসে উঠে দীপু ময়দানে পৌঁছে। গেল। ছবির ক্যাটালগের দাম এক টাকা, দীপু সেগুলো বিক্রির ভার নিয়ে বসল।

প্রদর্শনীতে ভিড় খুবই কম! অরূপের ছবির ভাললা সমালোচনা বেরিয়েছে সব কাগজে, কিন্তু একটাও বিক্রি হয়নি। ক্যাটালগ বিক্রি হল মাত্র সাত টাকার—দীপু সেই টাকাটা অরূপকে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাড়ে আটটার সময়। এখুনি বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। সে কিছুক্ষণ একলাই হাঁটতে লাগল ময়দানের মধ্যে দিয়ে। অন্ধকারে একলা হাঁটতে তার খারাপ লাগে না। তার নিজের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস আছে, সুতরাং সঙ্গীর অভাব হয় না।

শান্তা কি বাড়ি ফিরেছে? এখন কি শান্তার বাড়িতে যাওয়া যায়? দীপু চোখ বন্ধ করে শান্তাকে খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু সব কিছু ঝাপসা দেখাচ্ছে। অনেক লোকের ভিড়ে শান্তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। দীপু অস্ফুট গলায় বলল, শান্তা, আমি তোমাকে এক্ষুনি চাই।

একটু বাদে একজন পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকল, দীপাঞ্জনবাবু।

দীপু থমকে দাঁড়াল। লোকটি দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, দীপাঞ্জনবাবু, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে।

দীপু বিস্মিতভাবে বলল, আপনি, মানে, আমি তো ঠিক-

লোকটিকে দেখলে অবাঙালি বলে মনে হয়, কিন্তু কথা বলছে পরিষ্কার বাংলায়। দীপু জীবনে একে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

লোকটি বলল, আপনি তো রতনবাবুকে চেনেন, আমি তাঁর বিশেষ বন্ধু। আপনার দাদার নাম নীলাঞ্জন, তিনিও আমাকে চেনেন।

দাদার নাম শুনে দীপু একটু কেঁপে উঠল। দাদা রাজনীতি নিয়ে খুব জড়িত। অনেকদিন দাদার খোঁজ নেওয়া হয়নি।

লোকটি বলল, খুব একটা বিপদ হয়ে গেছে, আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে আমার সঙ্গে।

কোথায়? কার বিপদ?

এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই। গাড়িতে উঠুন, যেতে যেতে সব বলছি।

হতভম্ব দীপুর হাত ধরে প্রায় জোর করেই লোকটি পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়িতে তুলল।

দীপুর জ্ঞান ফিরল পরদিন সকাল দশটায়। চোখ মেলে প্রথমটায় সে ভাবল, এটা একটা স্বপ্ন-টপ্ন নাকি? এক মুহূর্তেই বোঝা যায়, স্বপ্ন নয়। তার ডান হাতে ব্যথা, কেউ তাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছিল, তবে আবছাভাবে মনে পড়ছে। মাথাটা এখনো পরিষ্কার হয়নি।

সে শুয়ে আছে একটা অচেনা ঘরে। ঘরটি বেশ বড়ো, কিন্তু খাট আর একটা টেবিল ছাড়া আরকোনো আসবাব নেই। হালকা নীল দেওয়ালের রং। দীপু উঠে প্রথমেই দরজাটা টেনে দেখল। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

দীপু ভীতু প্রকৃতির ছেলে নয়। সে বুঝতে পারল, কেউ তাকে জোর করে ধরে এনেছে এখানে। এ ব্যাপারে ভয় পাবার বদলে সে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে বসল। তাকে কে ধরে আনবে? এ ব্যাপারে কার, কী স্বার্থ থাকতে পারে?

দীপু কোনো উত্তর পেল না। যাই হোক, দেখা যাক। ঘর সংলগ্ন একটি বাথরুম আছে, সেখানে নতুন ভোয়ালে, টুথপেস্ট, ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম। দীপু সেখান থেকে প্রাতঃকৃত্য সেরে এল।

একটু পরেই দরজা খুলে একজন লোক এক ট্রে ভরতি খাবার নিয়ে এসে ঢুকল। তাতে দুধ, কর্নফ্লেকস, টোস্ট, কলা, আপেল ইত্যাদি রয়েছে। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে লোকটি জিজ্ঞেস করল, চা না কফি?

দীপু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার?

চা না কফি?

সে কথা পরে হবে। এখানে কী ব্যাপার চলছে? এটা হোটেল না কারুর বাড়ি?

বাড়ি। খেয়ে নিন, বড়োবাবু একটু পরে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

বড়োবাবু মানে কোন বাবু?

চা না কফি?

কফিই নিয়ে এসো তাহলে। তুমি সিগারেট আনতে পারবে? চায়ের পর আমি সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারি না।

ভরত গুপ্তর কাছে দীপুকে নিয়ে যাওয়া হল ঠিক বারোটার সময়। দোতলার ডাইনিং রুমে বিশাল টেবিলে এক প্রান্তে ভরত গুপ্ত একা বসেছিলেন। দু-জন লোক দীপুকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

ভরত গুপ্ত দীপুর আপাদমস্তক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, বোসো।

ভরত গুপ্তর ব্যক্তিত্ব এবং আড়ম্বরের সামনে দীপু একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। সে বুঝতে পারল, এটা তাকে কাটাতে হবে।

এরপর প্রায় এক মিনিট ভরত গুপ্ত কোনো কথাই বললেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন দীপুর দিকে। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দীপুও প্রথমে কী কথা দিয়ে শুরু করবে বুঝতে পারছে না।

ভরত গুপ্ত একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ! তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে, তুমি জান?

না।

আমার একটা বিশেষ শখ মেটাবার জন্য।

কিন্তু আমাকে জোর করে আনা হয়েছে। এটা অন্যায়।

তোমার ওপর এখন থেকে আর কোনো অন্যায় করা হবে না। ও-সব পুরোনো কথা ভুলে যাও।

দীপু তাকিয়ে দেখল, যে লোক দু-টি তাকে এ ঘরে নিয়ে এসেছিল, তারা তখনও দরজার কাছে প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। আর টেবিলের ওপাশের লোকটি গম্ভীর গলায় ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাকে কাবু করার চেষ্টা করছে।

দীপু সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, আমাকে কোনো অচেনা লোক তুমি বলে কথা বলে না। এখানে এসব কী হচ্ছে আমি জানতে চাই।

আমার নাম ভরত গুপ্ত।

এ নাম আমি আগে কখনো শুনিনি।

তোমার পক্ষে না শোনারই কথা। তোমাকে এখন থেকে এই বাড়িতে থাকতে হবে।

কেন?

তোমার কোনোরকম অসুবিধে হবে না। তুমি যা চাও তাই পাবে।

কিন্তু অন্য কারুর বাড়িতে আমি থাকতে যাব কেন?

দীপু নিজের ব্যক্তিত্ব ফোটাবার জন্য খানিকটা হালকা গলায় বলল, ব্যাপারটা কী বলুন তো? আপনি কি ডাকাত-টাকাত নাকি?

ভরত গুপ্তও হেসে জবাব দিলেন, না, আমাকে ডাকাত কেউ বলে না। চুরি-ডাকাতি আমি পছন্দ করি না।

তাহলে আপনার পেশা কী?

স্পেকুলেশান বলতে পার।

তার মানে কী? শেয়ার মার্কেট? সে যাই হোক, আপনি কি আমাকে নিয়েও ফাটকা খেলতে চান নাকি? আমাকে ধরে এনেছেন কেন?

এটা আমার একটা শখ। আমি চাই, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। দেখি, তুমি আমাকে হারাতে পার কিনা।

যুদ্ধ? আপনার সঙ্গে আমি কী যুদ্ধ করব?

তলোয়ার বন্দুকের যুদ্ধের কথা বলছি না। অন্যরকম। আমি সারাজীবনে অনেকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, পুলিশ, ব্যবসায়ী, পলিটিশিয়ান, আত্মীয়স্বজন। কিন্তু সত্যিকারের কোনো সৎ এবং নির্লোভ মানুষ আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমি সেইরকম একজন মানুষের সঙ্গে এবার একবার যুদ্ধ করতে চাই। অনেক খুঁজে খুঁজে তোমাকে আনানো হয়েছে।

দীপু হেসে বলল, আমি সৎ লোক? আপনার লোক নিশ্চয়ই ভুল করেছে। আমার অনেক রকম লোভও আছে, দুর্বলতাও আছে। আমি নিজেকে খুব ভালোরকম জানি।

ভরত গুপ্তও এবার হাসলেন। তারপর বললেন, গত দেড় মাস ধরে সবসময় তোমার পেছনে একজন লোক ঘুরছে। তোমার গতিবিধি সমস্ত কিছু আমার জানা। সারাকলকাতায় অনেকের পেছনে এ-রকম লোক লাগানো হয়েছিল। তাদের ভেতর থেকে হেঁকে তোলা হয়েছে তোমাকে। তোমাকে দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে।

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

ভরত গুপ্ত হুকুম করলেন, বোসো!

দীপু পেছন দিকে তাকাল। দরজার বাইরে দু-জন রক্ষী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ সে আরও বেশি বিস্মিত হয়ে পড়ছে। সে সত্যিই একটা অচেনা বাড়িতে বন্দি? কিছুতেই যেন

বিশ্বাস হতে চায় না। তার মতন একটা ছেলেকে এ-রকমভাবে বন্দি করে রেখে এদের কী লাভ? কাল সে বাড়ি ফেরেনি, ছোড়দি আর জামাইবাবু এতক্ষণ কী ভাবছে কে জানে!

আমি চলে যেতে চাইলে কি জোর করে আমাকে আটকে রাখা হবে?

আমি জোরজারি করা পছন্দ করি না। কিন্তু তোমার জন্য অনেকটা সময় এবং অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। তোমাকে এখনই চট করে যেতে দেওয়া যায় না। তুমি যেতে চাইছ কেন? তোমার বাবা-মা নেই আমি জানি! সংসারের কোনো দায়-দায়িত্ব তোমার নেই। এখানে তুমি সব কিছু পাবে।

আপনার এ- রকম অদ্ভুত শখের মানে কী?

লোকে আমাকে অসৎ লোক ভাবে।

লোকে আপনার সম্পর্কে যা খুশি ভাবুক, তাতে আমার কী আসে যায়?

তুমি সৎ আমি অসৎ, তোমার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। তুমি যদি জিততে পার, সেটা হবে একটা অদ্ভুত ঘটনা। পৃথিবীতে আজকাল আর এ-রকম ঘটনা ঘটে না। তা ছাড়া আমার একটা অদ্ভুত অসুখ আছে। অনেক চিকিৎসা করেও সেটা সারাতে পারিনি। আমার ধারণা, তোমার মতন কারুর কাছে আমি যদি হেরে যাই, তাহলেই আমার সেই অসুখটা সেরে যাবে।

কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। আপনি অসৎ, তার মানে কী? আমি নিজে জানি আমি কতখানি সৎ, আপনি বলুন তো, আপনি কত অসৎ।

অন্য অসৎ লোকদের জব্দ করার জন্য আমাকে আরও বেশি অসৎ হতে হয়। আমি চুপচাপ থাকলেই তারা আরও বড়ো হয়ে যাবে। আমার ঠাকুরদার বাবা কলকাতা শহরে এসেছিলেন লোটাকম্বল আর তেইশটা টাকা সম্বল করে। এখন আমি কলকাতা শহরের

অনেকখানি অংশের মালিক। শুধু কলকাতা কেন, আরও অনেক কিছুই আমার। এখানকার লোকেরা কখন, কী খাবে কিংবা খাবে না, সেটা আমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর।

ও, আপনি সেই ব্যবসায়ী কালোবাজারি, যাদের কথা কাগজে পড়ি?

না, কোনো কাগজে কখনো আমার নাম বেরোয় না। সেসব চুনোপুটিদের ব্যাপার। আর কালোবাজারি বললে আমাকে ছোটো করে দেখা হয়!

তাহলে আপনি কী?

আমাকে রাজা বলতে পার। আমাকে কেউ চেনে না, আমাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু আমি একটু আঙুল হেলালেই বিপর্যয় কান্ড বাধাতে পারি।

কথাগুলো কীরকম যেন নাটক নাটক মনে হচ্ছে।

এটা নাটক নয় দীপাঞ্জন বসু। এই জীবনের কথা তোমরা কেউ জান না।

ভরত গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

দীপু কৌতূহলী হয়ে তাঁকে অনুসরণ করল।

যে দু-টি ঘরে ভরত গুপ্ত নিজে ছাড়া আর কারুকে কখনো ঢুকতে দেন না, এক এক করে দীপুকে সেই ঘর দু-টিতে নিয়ে গেলেন।

একটি ঘরের চার দেয়ালে চারটি সিন্দুক। প্রায় মন্ত্র পড়ার মতন অঙ্ক কষে চাকা ঘুরিয়ে সেইসব সিন্দুক খুলতে হয়। ভরত গুপ্ত একটা একটা করে খুলে বললেন, এই দেখো! এ সবই আমার।

দীপু দেখল, ভরত গুপ্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন না। তাঁর আলমারিতে থরে থরে টাকা সাজানো। একটাতে শুধু সোনার বাট। আর একটিতে হীরে জহরৎ। আর একটি জিনিস দীপু দেখে চিনতেই পারল না, সেটি প্ল্যাটিনাম।

ঐশ্বর্যের একটা দীপ্তি আছে। চারটে সিন্দুক ভরা সম্পর্কে যেন ঝকমক করছে ঘরটা। দীপুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল একবার। তারপর আবার মনে হল, এগুলো সত্যি নয়, সব নকল।

ভরত গুপ্ত দেয়ালের কতকগুলি ছবির দিকে আঙুল তুলে বললেন, কলকাতায় সাতাশখানা বাড়ি আমার। বড়ো দুটো হোটেল আমার। স্টিল আর সিমেন্টের ব্যাপারে আমি যেকোনো সময় শেয়ারের বাজারে আগুন লাগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমার এই বাড়ি এখনো ভালো করে দেখোনি—এমন কোনো আরামের কথা চিন্তা করতে পার না, যা এখানে পাবে না। এ ছাড়া দার্জিলিং-এ, রাঁচিতে, পুরীতে, এলাহাবাদে, জয়পুরে, দিল্লিতে

ভরত গুপ্ত এগিয়ে এসে দীপুর হাত চেপে ধরে বললেন, এর সব কিছুরই ভাগ তুমি পাবে। তুমি যা চাও–

দীপু স্থিরভাবে লোকটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। অনেকদিন আগে সে বাইবেল পড়েছিল। শয়তান যিশুকে পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য আর ভোগ-বাসনার লোভ দেখাচ্ছে। পাহাড় চূড়ায় উঠে। ঠিক যেন সেইরকম শোনাচ্ছে।

পরক্ষণে দীপু লজ্জা পেল। এই লোকটিকে অমায়িক শয়তান ভাবতে গেলে নিজেকে যিশুর মতন মনে করতে হয়। কিন্তু সে তো যিশুখ্রিস্টের পায়ের নখেরও যোগ্য নয়।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনার কিছুই চাই না।

ভরত গুপ্ত উঁচু গলায় হেসে বললেন, আমি জানতাম, সৎ লোকেদের সামলানো এত সহজ নয়! আস্তে আস্তে হবে।

ওরা আবার চলে এল খাবার ঘরে। ভরত গুপ্ত চেঁচিয়ে আদেশ করলেন, খাবার দাও, আমাদের দুজনের।

দীপুর দিকে ফিরে তিনি বললেন, তুমি রোজ আমার সঙ্গে খাবে। আমি অবশ্য নিরামিষ পছন্দ করি, তুমি ইচ্ছে করলে মাছ মাংসও খেতে পার। আমাদের লড়াইটা কীরকম হবে জান? তুমি তোমার মতন থাকবে, আমি আমার মতন। আমি সবসময় চেষ্টা করব তোমাকে নষ্ট করতে। দেখি আমিই সেটা পারি, না তুমি আমাকে তোমার দলে টেনে ভালো করে দিতে পার। তুমি যাতে নিরস্ত্র বোধ না কর, সেইজন্যই তুমি এ বাড়ির যা খুশি জিনিস ব্যবহার করতে পার।

দীপু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, এসব কী বলেছেন, যার কোনো মাথা-মুন্ডু নেই! ভালো করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? আপনি অন্যায় করেছেন, পুলিশ আপনাকে জেলে দেবে।

ভরত গুপ্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, সব জেলখানাই আমার তুলনায় ছোটো। আমাদের মতন কয়েকজনকে ভরে রাখার মতন জেলখানা ভারত সরকার তৈরি করেননি।

কথাটা ভরত গুপ্ত এমন গাঢ় স্বরে বললেন যে, দীপু কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার রাগ হচ্ছে। দীপুর হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল এবার। সে আঘাত করার জন্য তৈরি হল। সরকার কিংবা দেশের নেতারা যদি এদের শাস্তি দিতে না পারে, সে একাই শাস্তি দেবে। তার হাতে এখন একটা স্টেনগান থাকার দরকার ছিল।

আবার তার মনে হল, রতনদারা কাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছিলেন, এদের বিরুদ্ধে? সে সম্পর্কে কিছুই তো করলেন না, শুধু নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি–

তিন-চারজন লোক সারিবদ্ধ হয়ে এসে খাবার রেখে গেল টেবিলের ওপরে। এত খাবার দু-জন কেন দশজন মানুষও খেতে পারে না।

ভরত গুপ্ত বললেন এসো, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

দীপু বলল, না।

দীপাঞ্জন, কেন এ-রকম অবাধ্যপনা করছ। আমি তোমাকে যা যা বললাম, একটাও তোমার পছন্দ হল না? তুমি কি সন্ন্যাসী, তোমার কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই?

আমি সন্ন্যাসী নই, আমার অনেক কিছুই চাইবার আছে। কিন্তু আপনার বাড়িতে আমি কিছুই ছোঁব না আর।

কেন?

আমার ঘেন্না হচ্ছে। এত লোক না-খেয়ে আছে, আর আপনার বাড়িতে এত টাকাপয়সা জমিয়ে রেখেছেন, আপনার লজ্জা হয় না?

শস্তা সেন্টিমেন্টাল কথা বোলো না! পৃথিবীতে চিরকালই বহুলোক খেতে পায়নি। সবসময়েই কেউ-না-কেউ অনেক বেশি পায়। এইসব বাজে কথা নিয়ে চেঁচাবে, ওই যারা পলিটিকস করে, যারা বেশি কিছু চায়। তুমি যুবক, তোমাকে আমি যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বললাম, সেই চ্যালেঞ্জটা নেবার সাহস হচ্ছে না তোমার?

দীপু কড়া চোখে ভরত গুপ্তর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, এই যুদ্ধের ফলাফল তো আমি আগে থেকেই জানি।

কী?

আপনি হেরে গেছেন।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

এর মধ্যে হাসির কিছুই নেই। অন্যায় কখনো শেষপর্যন্ত জেতে না। তা ছাড়া, আমি ভবিষ্যত দেখতে পাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি হেরে গেছেন, আমার কাছে না হলেও অন্য কারুর কাছে আপনি শেষপর্যন্ত হেরে গেছেন। লোকে আমাকে ঠিক বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি অনেক সময়ই ভবিষ্যতের ছবি নিজের চোখের সামনে দেখি। আমি আপনার কপাল দেখেই বুঝতে পারছি, আপনি হেরে যাওয়া মানুষ, আপনি ধুলোয় লুটোচ্ছেন।

তাই নাকি? তাই নাকি? আমি কতখানি হারব? সব সমেত হারব? এটা তো আমাকে দেখতেই হচ্ছে। তা হলে আমিই চ্যালেঞ্জ নিলাম, তোমাকে কিছুতেই আর ছাড়া হবে না। খেতে বি◌েসসা, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি আপনার বাড়িতে আর কিছুই খাব না। আমি এখনি চলে যাব।

ভরত গুপ্ত বিরাট এক ধমক দিয়ে বললেন, বলেছি, বোসো!

আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? জোর করে খাওয়াবেন!

হ্যাঁ।

দু-জন প্রতিহারী এসে দীপুকে জোর করে চেয়ারে বসাতে গেল।

দীপু ধস্তাধস্তি করে ছাড়াবার চেষ্টা করল নিজেকে। ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারে না।

ওরা দীপুকে খাবার টেবিলে বসিয়ে শক্ত করে ধরে রইল কাঁধের কাছে। ভরত গুপ্ত মিটিমিটি হাসছেন।

দীপু খাবারের রূপোর থালাটা তুলে ছুড়ে ফেলল মাটিতে। আলোয় একটা রূপোলি ঝলক উঠে ঝনঝন করে শব্দ উঠল।

ভরত গুপ্ত মৃদু গলায় বললেন, ওকে ওর ঘরে বন্ধ করে রাখো। মারধোর কোরো না।

সারাদুপুর বিভিন্ন ধরনের লোক দীপুর ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে গেল একবার করে। তার মধ্যে দু-একটি মেয়েও আছে। সকলের চোখেই প্রথম দিকে কৌতূহল, তারপর অবজ্ঞা।

সারাদুপুরটা দীপু শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করল। তার সবচেয়ে বেশি অবাক লাগছে এইজন্য যে, সে এমন কি করেছে, যার জন্য এই লোকটা তাকে সৎ বলছে? সে তো অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়।

বিকেলের দিকে দীপুর অসহ্য বোধ হল। সে চেঁচামেচি করে দরজা ধাক্কা দিতে লাগল। কেউ এল না। দুম দুম করে লাথি মারতে লাগল দরজায়। তবু কেউ আসে না। এই দরজা সে ভেঙে ফেলতে পারবে না।

দীপু অশ্রান্তভাবে চিৎকার করতে লাগল, দরজা খুলে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে যেতে দাও! আমার ঘেন্না করছে!

কেউ কোনো সাড়া দিল না। রাত্তিরে একজন খাবার নিয়ে এল তার জন্য। দীপু সেটাও ছুড়ে ফেলে দিল। না খেয়ে শুয়ে রইল। ঘুমিয়েও পড়ল একসময়।

পরদিন সন্ধ্যের সময় আবার দু-জন লোক দরজা খুলে দীপুকে বলল, আসুন!

দীপু বলল, আমি বাইরে যাব। আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকব না।

লোক দু-টি তবু দীপুর হাত ধরে নিয়ে এল দোতলায়। দু-দিন কিছু না খেয়ে দীপুর শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। তবু সে রাগে জ্বলছে। তাকে আনা হল আবার সেই খাবার ঘরে। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম ও কুড়ি-পঁচিশ রকমের কেক ও কুকি। এখন ভরত গুপ্ত একা নন। একটি যুবতী মেয়ে তাঁর চা হেঁকে দিচ্ছে।

ভরত গুপ্ত দীপুকে বললেন, বোসো। এখনো তোমার খিদে পায়নি?

দীপু বলল, আপনাকে তো বলেইছি, আপনার বাড়ির কোনো কিছুই আমি খাব না। আমাকে আটকে রেখেছেন কেন?

ভরত গুপ্ত সহাস্যে বললেন, এই খাবারগুলো আমার বাড়ির নয়, দোকানের। আমার মেয়ে নিয়ে এসেছে। এই আমার মেয়ে উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী মুখ ফেরালো দীপুর দিকে। দীপু দেখল, মেয়েটি সুন্দরী। মেজাজ খারাপ থাকলেও সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকাতে তার ভালো লাগে।

দীপু মেয়েটির দিকে দু-এক পলক তাকিয়ে থাকতেই একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। দীপু দেখল মেয়েটির জায়গায় শান্তা দাঁড়িয়ে আছে। তারপরেই দেখল শান্তা তার ছোড়দির বাড়িতে, ছোড়দি আর শান্তা কথা বলছে, দু-জনেই চিন্তিত। দীপু স্পষ্ট শুনতে পেল, শান্তা বললে, ও তো মাঝে মাঝেই এ-রকম দুমদাম করে চলে যায়। ঠিক ফিরে আসবে।

দীপু নিশ্চিন্ত হল। শান্তা আছে। সে উজ্জয়িনীর সঙ্গে কোনো কথা বলল না।

উজ্জয়িনী দু-পেয়ালা চা ছেকে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভরত গুপ্ত বললেন, উজ্জয়িনীর এখনো বিয়ে দিইনি। ওর যাকে পছন্দ তাকেই বিয়ে করবে। তবে, তাকে এই বাড়িতেই থাকতে হবে।

দীপু বলল, আমি এখুনি চলে যেতে চাই।

ভরত গুপ্ত গলার আওয়াজ যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বললেন, তুমি এত ছটফট করছ কেন? আর দু-তিনদিন এমনিই থেকে দেখোনা, তারপর না হয় যুদ্ধ শুরু করা যাবে?

আপনাকে তো আমি বলেইছি, যুদ্ধে আপনি হেরে গেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, এই বাড়িতে একদিন লাইব্রেরি হবে।

আমার জীবদ্দশায় আমি হারব না। সেইটাই তো চ্যালেঞ্জ। তোমার সাহস হচ্ছে না?

আপনার বাড়ির মধ্যে আমাকে আটকে রেখে তারপর বলছেন যুদ্ধের কথা? আপনার লজ্জা করে না?

না। জীবনে আমি কখনো লজ্জা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার ধারণা ওটা মেয়েদেরই ব্যাপার।

এই সময় গণেশলাল এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

ভরত গুপ্ত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই! তোমাকে তো ডাকিনি।

না ডাকতেও এসে পড়ার জন্য গণেশলালের যতখানি সংকুচিত হয়ে থাকা উচিত ছিল, তার ভাবভঙ্গি মোটেই সেরকম নয়। সে স্পষ্ট গলায় বলল, স্যার, একটা কথা বলতে এলাম, আজ এইসব থাক-না।

কী সব থাকবে?

এই যে বাবুটির সঙ্গে আপনি যেসব কথাবার্তা বলছেন, আজ বন্ধ রাখুন। আমরা বাবুটিকে নীচের ঘরে আটকে রাখছি, তারপর কাল যা হয় হবে।

তোমার এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

আজ অনেকগুলো জরুরি কাজের কথা ছিল।

কোনটা জরুরি, তা আমি ভালোই বুঝি, তুমি এখন যাও!

স্যার, আজকের দিনটায় এসব বাদ দিলেই ভালো হত-না?

গণেশলাল, তোমাকে আমি যেতে বলেছি।

...স্যার, আত্মারামজি সাংঘাতিক সব কান্ড শুরু করেছেন। চাল-ডাল-চিনির কারবার ছেড়ে উনি এখন সিমেন্ট আর লোহা নিয়ে পড়েছেন। খবর আছে কী উনি বাজার থেকে সব সিমেন্ট তুলে নেবেন।

জাহান্নামে যাক আত্মারাম। সে যা-খুশি করুক। আমার কোনো ক্ষতি সে করতে পারবে না।

কানপুরে আমাদের একজন এজেন্ট খুন হয়েছে। বোধহয় আসিফ সাহেবের লোকই–

এসব কাল শুনব। তুমি এখন যাও, এখুনি যাও।

গণেশলাল তবু একটু ইতস্তত করে, দীপুর দিকে একবার ক্রোধের দৃষ্টি হেনে অনিচ্ছার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ভরত গুপ্ত বললেন, ওরা ভাবে, এটা আমার একটা আজে-বাজে খেলা। কিন্তু আমি আমার অসুখ সারাতে চাই।

দীপু বলল, আমি যদি এখান থেকে জোর করে বেরিয়ে যেতে চাই, আপনার লোকজন কি আমাকে বাধা দেবে?

তাই তো মনে হয়। এখানে কারুর ঢোকা যেমন শক্ত, বেরুনোও তেমনি শক্ত।

কিন্তু একজন মানুষকে জোর করে আটকে রাখা যায়। দেশে কি পুলিশ বা আইনকানুন কিছু নেই।

আইনকানুনের কথা থাক। আমার যুদ্ধপ্রণালী বুঝি তোমার পছন্দ নয়? শোনো দীপাঞ্জন, তোমাকে একটা কথা বলি, তোমাকে আমার ক্রমশই বেশি পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। যত বেশি পছন্দ হচ্ছে, ততই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে পারছি না।

দীপু কঠোরভাবে বলল, আপনাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি।

ভরত গুপ্ত তার উত্তরে খুব নরমভাবে বলল, তাই তো ভালো।

দু-জন সম্পূর্ণ বিপরীত রুচির লোকেই তো যুদ্ধ জমে।

এটা যুদ্ধ নয়, ন্যাকামি। যুদ্ধ করতে চান, আমার সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ান।

রাস্তায়-ঘাটে তো ছোটোলোকরা যুদ্ধ করে। শারীরিক যুদ্ধ। সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব রাস্তায় হয় না।

আমি যদি এখন আপনাকে খুন করি। তারপর যা হয় হোক–

দীপাঞ্জন, তুমি আমাকে এখনো ঠিক চিনতে পারনি মনে হচ্ছে। আমাকে খুন করা যায় না।

দীপু ভরত গুপ্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুটি চেপে ধরবে ভাবছিল, কিন্তু শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালো।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উজ্জয়িনী ডাকল, পিতাজি।

কী রে?

আপনাকে মা ওপরে ডাকছেন।

ভরত গুপ্ত বিস্মিতভাবে বললেন, তোমার মা ডাকছেন? কোনো দিন তো ডাকেন না। তাঁকে বলো, আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।

উজ্জয়িনী দৌড়ে এসে ভরত গুপ্তর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, একবার চলো। আজ একবার চলো।

ভরত গুপ্ত তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ-রকম পাগলামি করে না।

বাইরে কোনো একটা বড়ো ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল। তখন স্বরূপা দেবীকে দেখা গেল দরজার কাছে। বহু বছরের মধ্যে তিনি এই সময় দোতলায় স্বামীর কাছে আসেননি। স্বরূপা দেবী বললেন, আমি এসেছি, আপনি রাগ করবেন না। এই ছেলেটিকে নিয়ে আপনি কী করছেন? এতে আমাদের অমঙ্গল হবে।

ভরত গুপ্ত বললেন, উজ্জয়িনীর মা, তুমি ওপরে যাও। আর কখনো তুমি আমার কাজে নাক গলাতে এসো না।

এটা কোনো কাজের ব্যাপার নয়। আপনি আগে কখনো কোনো বাইরের লোককে এ বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসেননি। তার জন্য অন্য বাড়ি আছে।

তোমার কি পাকাপাকি কাশীতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে?

স্বরূপা দেবীর মুখখানা রাগে টকটকে হয়ে গেল। তিনি দৃপ্তভাবে বললেন, আমি মরার আগে এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। দীপু পর্যায়ক্রমে উজ্জয়িনী আর স্বরূপা দেবীর দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল, ওদের দুজনের মুখেই রীতিমতন আশঙ্কার ছায়া। ওরা কি তাকেই এত ভয় পাচ্ছে?

দীপু বলল, আপনারা আমাকে এখানে ধরে রেখেছেন কেন? এই ভরত গুপ্ত নামের লোকটি কি পাগল?

স্বরূপা দেবী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ভরত গুপ্ত হুংকার দিয়ে উঠলেন, চুপ! আমার ইচ্ছেতে কেউ কখনো বাধা দিতে পারে না। স্বরূপা আর কখনো এ সময় নীচে আসবে না।

উজ্জয়িনী তখন প্রেমিকার মতন ভরত গুপ্তর বুকে মাথা ঘসে তাঁকে ভোলাতে চাইছে। ভরত গুপ্ত স্ত্রীকে কোনো একটা কঠিন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগে স্বরূপা দেবী নিষ্ঠুরের মতন বললেন, আজ শুক্রবার।

সঙ্গে সঙ্গে ভরত গুপ্তর মুখখানা বদলে গেল। ঘুরতে লাগল চোখ দুটো। চিৎকার করে বললেন, আমি আজও ভুলে গিয়েছিলাম! আজও ভুলে গিয়েছিলাম! যেদিন থেকে আমি এইরকম একটা লোককে খুঁজছি, সেদিন থেকে আমি ভুলে যাচ্ছি। সর্বনাশিনী, তুই কেন মনে করিয়ে দিলি?

বেশ করেছি।

ভরত গুপ্ত ঝটকা দিয়ে মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দীপুর দিকে ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করতে লাগলেন, একে আমার চাই। একে আমার চাই।

ভরত গুপ্তর হঠাৎ এই পরিবর্তনে এতক্ষণ বাদে ভয় পেয়ে গেল দীপু। পাগল দেখলে সকলেরই ভয় হয়। ভরত গুপ্ত তার শরীর স্পর্শ করতেই সে এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়োল।

পেছনে পেছনে তাড়া করে এলেন ভরত গুপ্ত। গর্জন করতে লাগলেন, আমি একে ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না। এ আমাকে বাঁচাবে। এ আমাকে শুক্রবারের কথা ভুলিয়ে দেবে। আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। যেদিন থেকে আমি একে খুঁজেছি, সেদিন থেকেই ভুলে যাচ্ছি।

দীপু দৌড়ে এসে দেখল বারান্দার কোণে কোলাপসিবল গেট বন্ধ। ভরত গুপ্ত প্রায় তার পেছনে এসে পড়েছে। দীপু চট করে ঘুরে গিয়ে ভরত গুপ্তকে একটা ধাক্কা দিয়ে অন্যদিকে ফিরল। কোনোদিকেই বেরুবার পথ নেই, তবু ভরত গুপ্ত অনেক চেষ্টা করেও দীপুকে ধরতে পারলেন না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে তিনি গেট ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন, দরজা খোললা। দরজা খোলো।

কেউ দরজা খুলল না। ভরত গুপ্ত আর্তনাদ করতে লাগলেন মা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল, মা, তুমি কোথায়? মা, তুমি কোথায়? টলতে টলতে তিনি নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম

করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই আর্তনাদ। আর দেয়ালে দুম দুম করে মাথা ঠোকার শব্দ।

দীপু দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে উজ্জয়িনী আর তার মা। চোখের দিকে চোখ।

স্বরূপা দেবী বললেন, বেটা, তুমি চলে যাও।

দীপু অন্যদিকে তাকিয়ে দেখল, একজন প্রহরী এসে গেটের তালা খুলছে। দীপু ছুটে এল সেদিকে। উত্তেজিতভাবে বলল, আমি বাইরে যাব।

প্রহরীটি গেট খুলে সরে দাঁড়াল। দীপু বাইরে পা দিতেই সে দীপুর ঘাড়ে এক ধাক্কা দিয়ে বলল, অভি নিকালো।

দীপু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকটা সিঁড়ি। নিছক স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় সে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটিকে প্রতি আক্রমণ করা জন্য। পরক্ষণেই মনে পড়ল, তাকে বাইরে যেতে হবে। সে আবার তরতর করে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।

নীচের ধাপেও আবার লোহার গেট, সেখানেও আর একজন প্রহরী। সে একইভাবে দীপুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, অ্যাভি নিকালো!

কোথা থেকে গণেশলাল ছুটে এসে দীপুর গালে দারুণ জোরে এক চড় কষিয়ে বলল, বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা!

অন্যান্য কর্মচারীরা প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধ। যেন প্রত্যেকেই মনে করেছিল, দীপুর জন্য এই প্রাসাদ ভেঙে পড়বে। তারা সকলেই দীপুকে মারতে মারতে বলতে লাগল, আভি নিকালো, আভি নিকালো, দূর হয়ে যা আপদ।

আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের চেষ্টায় দীপুও হাত চালাতে লাগল অন্ধের মতন। ছুটল বাগানের গেটের দিকে। সেখানে দু-জন প্রহরী তাকে দুটো লাথি দিয়ে ছুড়ে ফেলল রাস্তায়।

ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে দীপু উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সামনের দিকে। সে মুক্তি পেয়েছে, তার পায়ে এখন অনেক জোর এসে গেছে। খানিকটা দূর গিয়ে দীপু আবার থমকে দাঁড়াল। দীপু আবার ফিরে এল সেই বাড়ির কাছে। বুক ভরতি নিশ্বাস নিয়ে সে খুঃ করে থুতু ফেলল সেই বাড়ির গেটে। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, তোমরা হেরে যাবে। তোমরা ঠিক হেরে যাবে।